শ্রীবিমলেন্দ্রসিংহ

বাংলার চাষী

ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
এম্ এ, ডি এস, সি, এম্ এল্ এ,
কর্ত্তৃক লিখিত ভূমিকা সহ

শ্রীবিমল চন্দ্র সিংহ
প্রণীত।

বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি
৩-১, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

-প্রজাহিতৈষণা যাঁর অন্তরের বৃত্তি ছিল
সেই স্বর্গগত পিতৃদেবের চরণকমলে-

ভূমিকা

এই পুস্তকখানি খুবই সময়োপযোগী হইয়াছে। তরুণ গ্রন্থকার এই বয়সেই বাঙ্গালাদেশের কৃষি ও অর্থ-সমস্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা বিশেষ আনন্দের কথা। আমি ভরসা করি বাঙ্গলাদেশের অভিজাত বংশ সমূহের—বিশেষতঃ জমিদারদিগের মধ্যে শ্রীমান্ বিমলচন্দ্রের উদ্যম ও উৎসাহ সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইবে। পল্লীগ্রামের নানা সমস্যা ও কৃষকদের বহু অভাব অভিযোগ দেশের লোকের সমবেত চেষ্টা দ্বারা কতক পরিমাণে সমাধান করা যাইতে পারে, কিন্তু এসকল বিষয়ে সম্পূর্ণ ফললাভ করিতে হইলে রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক। ভারতীয় কৃষি কমিশন সরকারী ও বেসরকারী সমস্ত কর্ম্ম বিভাগের একত্রীভূত প্রচেষ্টা দ্বারা এদেশে কৃষি ও কৃষকের উন্নতি করিবার জন্য সকলকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত এবিষয়ে বিশেষ কিছুই প্রযত্ন হয় নাই। তবে কৃষি-কমিশনের সভাপতি লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো মহোদয় শীঘ্রই ভারতবর্ষে প্রধান শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিতেছেন, এজন্য অনেকেই আশান্বিত হইয়াছেন। সমগ্র ভারতের কথা ছাড়িয়া দিয়া

শুধু বাঙলার দিকে তাকাইলে দেখা যায় যে এ প্রদেশের কৃষিজীবী, তথা জমিদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে যাইতেছে। অচিরে কৃষিসম্বন্ধে সুব্যবস্থা না হইলে এই সকল শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণের পরিণতি কি হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। গ্রন্থকার কৃষির উন্নতির জন্য যে সকল প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা নিতান্ত আবশ্যক। এ বিষয়ে সম্যক্ আলোচনা এবং জনমত গঠনও বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। আমি এই পুস্তকের ও এই ধরণের অন্যান্য গ্রন্থ-সমূহের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয় মনে করি। ইতি—

[illegible]

নিবেদন

১৯৩৪ সালে ভারত সরকারের অর্থসচিব স্যার জর্জ্জ শুষ্টার সাহেব যখন শুষ্টার রেজলিউসন পাশ করেন, তখন বোঝা গিয়েছিল যে পল্লীসংস্কারের দিকে ভারত গভর্ণমেণ্টের আগ্রহ রয়েছে। তারপর ১৯৩৫ সালে ভারতসরকারের এক কোটি টাকা মঞ্জুর এর প্রকৃষ্টতর প্রমাণ। তারপর বাংলা গভর্ণমেণ্ট ও অল্পদিনের মধ্যে পল্লীসংক্রান্ত অনেকগুলি আইন পাশ করায় বোঝা যায় যে পল্লীসংস্কারের দিকে বাংলা গভর্ণমেণ্টেরও নজর পড়েছে। আইনগুলি কতদূর কার্য্যকরী হবে—সে কথা আলাদা, কিন্তু পল্লীর উন্নতির চেষ্টা যে গভর্ণমেণ্টের মনে এসেছে এটা নিশ্চিত। এর অনেক আগে থেকেই জনমত পল্লী-সংস্কারের জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু এই উৎসাহের তুলনায়, পল্লীসংস্কারের কাজের উপযুক্ত বই বাংলাভাষায় খুবই কম বল্‌লেও অত্যুক্তি হবে না। পল্লীসংস্কারের উন্নত ধারণা এখনও প্রধানতঃ শিক্ষিত অভিজ্ঞ চিন্তাশীল লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। কিন্তু যাদের নিয়ে পল্লী, সেই চাষীদের মনে যদি পল্লীসংস্কারের ধারণা বদ্ধমূল না হয়, তা হলে পল্লীসংস্কারের আশা সুদূর পরাহত।

"বাংলার চাষীর" মধ্যে পল্লীসংস্কারের এমন কতকগুলি

বিষয়ের আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে যা চাষীদের চেষ্টায় এই মুহূর্ত্তেই সম্ভব। সেইজন্য চাষীদের জীবন এই মুহূর্ত্তে কি কি সমস্যা এসে উপস্থিত হয়েছে আর চাষীরা কি করে গভর্ণমেণ্ট বা অন্য কারুর সাহায্য না পেয়েও সেই সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারে, কেবল সেই কথারই অবতারণা করা হয়েছে। এই জন্যই গভর্ণমেণ্টের মুদ্রানীতি সম্বন্ধে কোন কথা বলা হয়নি, বা বড়ো বড়ো ফ্যাক্‌টরী স্থাপনা করার কথা আলোচিত হয়নি, কারণ কেবল চাষীদের পক্ষে সে সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। সেইজন্য যদি একজন চাষীরও এতে সামান্য কোন উপকার হয় তাহলেই শ্রম সফল হবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায় ডি, এস্, সি (ইকন্) মহাশয় বইখানির ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাদের চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এম্-এ লেখার কাজে ও প্রুফ সংশোধনের সময় বহু সাহায্য করে আমাকে ঋণী করেছেন। বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি বইখানিকে প্রকাশ করে আমার আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন।

ইতি—

গ্রন্থকার

পাইকপাড়া রাজবাটী
১লা জানুয়ারী, ১৯৩৬

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্। বঙ্কিমচন্দ্র।

বহুদিন আগেই কবি গেয়ে গিয়েছেন বাংলা সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা। গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্রের পলি হতে যে দেশের উদ্ভব হয়েছিল সে দেশ যে সুজলা সুফলা সেটা খুব আশ্চর্য্যের কথা নয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা না হলেও তার এই শ্যামল রূপটাই বাঙালীর চিত্ত অধিকার করে বসে আছে। বিহারের পাহাড়, যুক্তপ্রদেশের কঠোর সৌন্দর্য্য, ভূস্বর্গ কাশ্মীর, এসকলেরই শোভা আমাদের হৃদয়ে দাগ দিয়ে যায়। হরিদ্বারের স্বচ্ছ গঙ্গার শোভায় উজ্জ্বল পাহাড়, সিমলার নগাধিরাজের সৌন্দর্য্য, বা পুরী, ওয়াল্‌টেয়ার, মাদ্রাজের উত্তাল সাগরের দৃশ্য—এসমস্তই আমাদের চিত্তাকাশে দীপ্ত হয়ে আছে; কিন্তু তবু যখন আমাদের ঘন শ্যামল বাংলাদেশের কথা মনে আসে তখন

প্রিয়জনের নিজস্ব রূপের যে মোহ সেই মোহ আমাদের মনকে অধিকার করে বসে। এবং সে মোহ দূর করার যে কোন দরকার আছে তা মনে করি না। সেই জন্যেই বাংলার এই শ্যামল স্নিগ্ধরূপে সমস্ত বাঙালীর হৃদয়ে ধ্বনিত হয়ে ওঠে—

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে,
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে।
জানিনা তোর ধন রতন
আছে কি না রাণীর মতন,
জানি শুধু আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে ॥

বাংলার এই শ্যামল স্নিগ্ধরূপ তার কৃষি হতে উদ্ভূত। কৃষিই হচ্ছে তার প্রধান সম্পদ আর কৃষিপ্রধান দেশ বলেই বাংলার খ্যাতি। এই কৃষি হতেই এককালে তার সমৃদ্ধি বেড়ে উঠে সমস্ত ভারতের বিস্ময়ের কারণ হয়েছিল—আর সেই কৃষির অবনতিতেই আজ সমস্ত বাংলার অবনতি। বাংলার কৃষির সঙ্গে সঙ্গে কেবল কৃষকের অবনতি হয়নি—যতরকম পেশার লোক বাংলায় আছে—তাদের সকলেরই অবনতি হয়েছে, কারণ বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ এবং কৃষির সঙ্গে সঙ্গেই আর সব জড়িত।

মোটামুটি বল্‌তে পারা যায় যে বাংলায় শতকরা ৬৬ জন লোক কৃষি আর তার সম্পর্কিত কাজে লেগে আছে; অন্যদিকে ব্যবসায়ে ১০ জন, আর যানবাহনাদির কার্য্যে ১ জন নিযুক্ত।

কাজেই দেখতে পাওয়া যায় যে ব্যবসায়ে যে পরিমাণ লোক নিযুক্ত রয়েছে তার প্রায় ৬½ গুণ লোক কৃষির উপর নির্ভর করে।

সমস্ত বাংলা এখনও কৃষিপ্রধান এবং কৃষির উপরেই বল্‌তে গেলে তার একমাত্র ভরসা। এখনও বাঙালীর ব্যবসায় গড়ে ওঠেনি এবং সমস্ত অবস্থা বিবেচনা কর্‌লে বাংলা যে অদূর ভবিষ্যতে কখনও ব্যবসায়ে প্রধান হয়ে উঠবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সে পরে যাই হোক্, উপস্থিত দেখা যাচ্ছে যে বাংলার উন্নতি মানে বাংলার কৃষির উন্নতি।

বাংলার কৃষির কি অবস্থা হয়েছে আর কি উপায়ে তার উন্নতি সাধিত হবে—সে সব বিষয়ে আলোচনা করার পূর্ব্বে আগে কি কারণে বাংলার কৃষির এত সমৃদ্ধি ছিল সেটা জানা প্রয়োজন।

সে সময় বাংলার অবস্থা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে সে সময় বাংলার অবস্থা বড় অদ্ভুত রকমের ছিল। বাংলার ব্যবসায় সমস্ত জাতির ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত অংশ ভাবে গড়ে ওঠেনি, সে সময় বাংলার আভ্যন্তরীণ যা সব ব্যবসা চল্‌তো তা অত্যন্ত ছোট ভাবে চল্‌তো। তখন বাংলার গ্রামকে তার অভাব দূর করার জন্যে বেশী দূরে যেতে হত না। হয় সেই গ্রাম থেকেই বা বড় জোর তার পাশাপাশি আর দু একটা গ্রামের থেকেই তার অভাব মিটে যেত। তাই সে সময় দেখতে পাওয়া যায় যে বাংলার প্রত্যেক গ্রাম নিজের অভাব পূরণ করেছে, বাংলার প্রত্যেক সহর নিকটবর্ত্তী গ্রাম হ'তে তার

অভাব পূরণ করেছে—আর বাংলার অর্থনৈতিক জীবন স্বকীয় পন্থা অবলম্বন করে চলেছে।

কিন্তু বাংলার এই আভ্যন্তরীণ স্বতঃ-সম্পূর্ণতা থাকলেও তার যে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়নি তা নয়। সে সময়ের ইতিহাস পড়লে জানা যায় যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার প্রচুর আন্তর্জাতিক ব্যবসা ছিল। সে সময় বাংলা হতে প্রচুর পরিমাণে মস্‌লিন প্রভৃতি তুলোর জিনিষ, সিল্ক, আফিং প্রভৃতি নানা জিনিষ বাংলা হতে রপ্তানি হত। অধ্যাপক যোগীশ চন্দ্র সিংহ মহাশয় * তাঁর বইয়ে দেখিয়েছেন যে ১৭৫৩ সালে তুরানীরা ১ লক্ষ, পাঠানরা ১½ লক্ষ, আর্মিনিয়ানরা ৫০ লক্ষ, মোগলরা ৪ লক্ষ, ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশে ২ লক্ষ, ইংরেজ কোম্পানী সাড়ে তিন লক্ষ, অন্য ইংরেজ ব্যবসায়ী ২ লক্ষ, ফরাসী কোম্পানী ২½ লক্ষ, অন্য ফরাসী ব্যবসায়ী ৫০ হাজার আর ওলন্দাজ কোম্পানী ১ লক্ষ, মোট ২৩ লক্ষ আর্কট টাকার জিনিষ বাংলা হতে কিনে নিয়ে গিয়েছে। এই থেকেই বোঝা যায় যে ইরাণ, তুরাণ, ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি বহু দূর দূরান্তরের সঙ্গে বাংলার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। হুগলী ছিল প্রধান বন্দর আর গঙ্গা দিয়ে সমস্ত ব্যবসায় চল্‌তো। তা হলেই দেখতে পাই যে বাংলা সে সময় আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের একটা প্রধান কেন্দ্র হয়ে পড়েছিল।

† Economic Annals of Bengal.

সাধারণতঃ দেখা যায় যে সব দেশ আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ স্থাপন করে লাভের সঙ্গে ব্যবসায় চালাচ্ছে, সে সব দেশের আভ্যন্তরিক ব্যবসায়ও সেই আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের তালে চলে। যেমন যখন ইংলণ্ডে শ্রমশিল্প বিপ্লব হয়ে গেল সে সময় সমস্ত দেশটা চাষ-বাস ছেড়ে দিয়ে বড়ো বড়ো ব্যবসায়ে লেগে গেল। কিন্তু বাংলায় আমরা এই নিয়মটীর একটা ব্যতিক্রম দেখতে পাই। একধারে বড়ো বড়ো আন্তর্জাতিক ব্যবসা হতে বহুটাকা আস্ছে অথচ অন্যধারে আভ্যন্তরিক ব্যবসা আপনার মনের মতো কেবল আশপাশের খবর নিয়ে সেই অনুসারে চলেছে, মনে হয় যেন দুটোর মধ্যে কোন সম্বন্ধই নেই। অথচ আভ্যন্তরিক ব্যবসায়ের সঙ্গে সম্বন্ধ না রেখে আন্তর্জাতিক ব্যবসায় দাঁড়াতে পারে না। বাংলায় এক অদ্ভুত উপায়ে আভ্যন্তরিক ব্যবসায়ের সঙ্গে বহির্জগতের ব্যবসায়ের মিল হয়েছিল—কোনোটাই কোনোটার বিরোধী হ'ত না।

এর প্রধান কারণ হচ্ছে যে বাংলার রপ্তানি আমদানীর চেয়ে বেশী ছিল। সমস্ত আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের মধ্যে বাংলার প্রভুত্ব ছিল বল্লেও অত্যুক্তি হবে না। কাজেই বাংলা আন্তর্জাতিক ব্যবসায়কে নিজের ইচ্ছে মত চালনা করেছে। বাংলার আভ্যন্তরিক ব্যবসায়টাই আপন সহজগতিতে বেড়ে চলেছে আর আন্তর্জাতিক ব্যবসায়টাই তার অনুগত হয়ে চলেছে

কিন্তু আজকাল অবস্থাটা ঠিক্ উল্টে গেছে। এখন বাংলায়

একটা বড়ো মিল কর্‌তে গেলেই মনে কর্‌তে হয় মিলের জিনিষ বিলেত বা আমেরিকার বাজারে কাট্‌বে কি না। রপ্তানি আমরা এখনো করি, কিন্তু আগে যেমন রপ্তানি করার সময় বাংলার ব্যবসায় জগতে শ্রেষ্ঠত্ব থাকার জন্যে সে রপ্তানি কর্‌তেও পার্‌তো বা না করেও হয়তো চালাতে পার্‌তো, এখন আর সে অবস্থা নেই। এখন বাংলাকে যেন অন্য দেশের হাতে পায়ে ধরে রপ্তানি কর্‌তে হয়, যেন অন্যদেশের অনুগ্রহের উপরেই আমাদের রপ্তানি নির্ভর কর্‌ছে। এখন বিলেত বা আমেরিকার ব্যবসায়ের জন্য যদি বাংলা কাঁচা মাল না পাঠাতে পারে, তা'হলে বিলেতের কাছে আমাদের যে ঋণ আছে এবং অন্য নানা খরচ বিদেশী শাসন ব্যবস্থার জন্য বিলেতে পাঠাতে হয়, তা জোগাড় করা অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়াবে ও বাংলায় হাহাকার পড়ে যাবে। সত্যি সত্যি হয়েছেও তাই। আমেরিকা কাগজের থলি করে ও অন্যান্য যন্ত্র দিয়ে চটের চাহিদা কমিয়ে দিলে—বাংলার পাট রপ্তানি কমে গেল আর বাংলায় বিষম অর্থসঙ্কট প্রকাশ পেল। তাই এখন আমেরিকা ও বিলেত বাংলার রপ্তানি না নিলে বাংলার সর্ব্বনাশ হবে। কিন্তু আগে বাংলা রপ্তানি না কর্‌লে ইয়োরোপে নানা ক্ষেত্রে অসুবিধে হ'ত। রপ্তানি আগেও করেছি, এখনও কর্‌ছি। কিন্তু ভেতরে ভেতরে অবস্থাটা একেবারে উল্টে গিয়েছে।

এ ছাড়া সে সময় এমন কতকগুলি আচার বাংলায় ছিল যার

জন্য বাংলার প্রচুর উন্নতি হয়েছিল। সে সময় বাংলাদেশে চাষের সঙ্গে সঙ্গে কুটির-শিল্প চল্‌তো। কেবলমাত্র চাষের আয়ের উপরই নির্ভর ছিল না। আর তা ছাড়া এখন জীবনে যেমন নানা রকম সমস্যা দেখা দিয়েছে, তখন সে সব সমস্যা ছিল না। এখন আমরা দেখতে পাই যে সভ্যতার যে মাপকাঠি ছিল সেটা অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। আগে যেখানে চিড়ে-গুড়ে চল্‌ত এখন সেখানে বিলাতি শর্করাযুক্ত রসগোল্লার আবির্ভাব হয়েছে। এইটে হতেই বোঝা যায় যে আমাদের জীবনযাত্রা কতো বেশী ব্যয়সাধ্য হয়ে পড়ছে। আমাদের সরল গ্রাম্য জীবনের দিন চলে গিয়েছে—তার স্থানে বহু সমস্যাপূর্ণ সহরের জীবন এসে গ্রামে প্রবেশ কর্‌ছে। পূর্ব্বে যাদের খালি গায়ে বসন্তসন্ধ্যা কাটাতে লজ্জাবোধ হ'ত না, তাদের ও এখন শুনি সিল্কের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আমি কেবল চাষীদের দোষ দিচ্ছি না—সকলের মধ্যেই এই ঝোঁক্ দেখা দিয়েছে।

অনেকে বলেন যে জীবনযাত্রা যতো ব্যয়সাধ্য হয় ততোই ভাল, কারণ তাতে বোঝায় যে জাতির অর্থ বেড়ে উঠ্‌ছে। যে জাতের সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর লোকও বায়োস্কোপ দেখতে পারে, ক্লাবে যেতে পারে, সমবায়-সঙ্ঘ গড়ে তুল্‌তে পারে, বুঝতে হবে সে জাতের টাকা বেশী। আরও বুঝতে হবে যে তার সেই উন্নত জীবনযাত্রা বজায় রাখ্‌বার জন্য সে জাতকে পরিশ্রম করে টাকা আন্‌বার চেষ্টা কর্‌তে হয় এবং সে চেষ্টায় তারা সফলও হয়।

কথাটাও সত্য। কিন্তু যে জাতের মধ্যে জীবনযাত্রা উন্নত হচ্ছে কিন্তু টাকা আনার ক্ষমতা বাড়ছে না, সে জাতের মধ্যে জীবনযাত্রার উন্নতি একটা অস্বাস্থ্যকর লক্ষণ। আমাদের যে জীবনযাত্রার উন্নতি সেটা কেবল একাঙ্গীন বৃদ্ধি বলে মনে হয়।

পূর্ব্বে জীবনযাত্রা উন্নত করবার জন্য অশান্ত আকাঙ্খা না থাকায় চাষীকে অনবরত আয় বৃদ্ধির চিন্তা করে কেবল জটিল হতে জটিলতর সমস্যা সৃষ্টি কর্‌তে ব্যস্ত থাক্‌তে হয় নি। সে নিজের জানাশোনার মধ্যেই কেনা বেচা করে তার সরল জীবনযাত্রা চালিয়ে গিয়েছে। তার যা আয় হতো তার তুলনায় তার জীবনযাত্রা নিতান্তই অল্পব্যয়সাধ্য ছিল—সেইজন্য বাংলার চাষীর সমৃদ্ধি বেড়ে চলেছিল। এই সঙ্গে আরও একটা কথা বল্‌তে পারা যায়। বাংলায় যতো চাষী-সম্প্রদায়ের মধ্যে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে—জমি ততোই বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। একশ’ বছর আগেকার বিবরণ পড়্‌লে জানা যাবে যে প্রত্যেক চাষীর ভাগে এখনকার চাষীর অপেক্ষা অনেক বেশী জমি ছিল—আর সেই জন্য তার আয়ও নিশ্চয়ই বেশী ছিল।

তা ছাড়াও আগে জমির উর্ব্বরতা বেশী ছিল। অবশ্য রমেশ দত্ত মহাশয়, ডাঃ ক্লাউষ্টন প্রভৃতি বলেছেন যে বাংলার মাটীর উৎপাদিকা শক্তি কমে যাচ্ছে না—কিন্তু আজকালকার পণ্ডিতদের অনেকের মতে উর্ব্বরতা কমতির দিকেই যাচ্ছে।

পূর্ব্বে বাংলায় প্রত্যেক বছর নদীতে জলপ্লাবন হ'ত; কোন কোন বার খুব বেশী হ'ত, কিন্তু প্রত্যেক বছর অল্প অল্প জলপ্লাবনের ফলে বাংলার চাষ জমির উপরে পলি মাটি পড়ে জমির উর্ব্বরতা বাড়াতো। কিন্তু মেঘনাদ সাহা, বেণ্টন, বেণ্টলী, উইলকক্স—এঁরা সব বলেন যে সে সব নদীকে রেলওয়ের জন্যে বাঁধ দিয়ে বাঁধা হয়েছে আর তার বাৎসরিক জলপ্লাবনের অভাবে বাংলার উর্ব্বরতা কমেছে। আর এই জন্যেই নাকি ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। আর প্লাবনের কথা দূরে থাক্ এখন আর নদীতে প্রচুর জলও নেই। কিন্তু আগে এই সব অসুবিধা না থাকায় জমির উর্ব্বরতা অনেক বেশী ছিল। সে জন্য চাষী যথেষ্ট লাভবান হ'তো।

তখন দেশে একটা চমৎকার নিবিড় শান্তি বাংলার পল্লীপ্রাণকে সরস করে রেখেছিল। টাকার দরের উঠানামার ধাঁধাঁ ছিল না—সকল জিনিষেরই দাম প্রায় স্থির থাক্‌তো। এ ধারে জমি হতে বহু আয়, ওধারে ব্যয় কম। মনে কেবল অশান্ত পিপাসার জন্য জটিল সমস্যা দেখা দেয়নি, দেশ দেশান্তরের চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামাতেও হ'তো না—মনের আনন্দে সকলে দিন কাটাত।

অর্থনৈতিক জগতের হিসেব কেতাবের মধ্যেও এর দাম বড় কম নয়। প্রত্যেক জাতের উন্নতির পেছনেই আছে একটা বিরাট মনোবৃত্তি। ইংরেজদের উন্নতির যুগের ইতিহাস পড়লে দেখতে পাই একজন আমেরিকা জয় করছেন একজন জলে

নেপোলিয়নকে হারাচ্ছেন—একজন স্থলে নেপোলিয়নকে হারাচ্ছেন—এধারে ভারত বিজয় চলেছে—ওধারে ভারত দ্বীপপুঞ্জ, চীন, জাপানের কিছু কিছু অধিকার চলেছে—ব্যবসায়ের প্রসার হচ্ছে—কাব্যের উন্নতি হচ্ছে—সাহিত্যের প্রসার হচ্ছে—দার্শনিক চিন্তাধারা উন্মেষ লাভ কর্‌ছে—যেন বিজয়লক্ষ্মী অজস্রধারে অমৃত বর্ষণ কর্‌ছেন। তেমনি ভারতের যখন উন্নতি হয়েছিল—তখন দেখি—একধারে ন্যায় বিচার হচ্ছে—অন্য ধারে বেদান্ত—আবার স্মৃতি—পুরাণালোচনা হচ্ছে—অমর কাব্য লেখা হয়েছে, ভারতের বাণিজ্য দূর দূর দেশে প্রসার লাভ কর্‌ছে—দেশদেশান্তর হতে পর্য্যটকেরা আসছেন; একধারে বিরাট বৌদ্ধধর্ম্ম গড়ে উঠেছে—আর একধারে আরো বিরাট পুরুষ শঙ্করাচার্য্য অটল জ্ঞানের স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন—যেন সব দিক দিয়ে একটা অপূর্ব্ব উন্নতি হচ্ছে।

কিন্তু এর পিছনে হচ্ছে জাতির একটা মনোবৃত্তি। একটা জাত যখন জাগে তখন সবদিক্ দিয়ে জাগে।

কাজেই বাংলার চাষীর সে যুগের উন্নতির কারণ আলোচনা কর্‌তে গেলে সে যুগের মনোবৃত্তিটার ফলটাকেও ধরতে হবে। সে যুগের জীবন্ত মন চাষীর লাভে কম সাহায্য করেনি। সেই মনই তাকে উৎসাহ দিয়েছে, অভাব সহ্য করার ক্ষমতা দিয়েছে। সেইজন্যে এ মনোবৃত্তিকে অবহেলা কর্‌লে আমাদের ভুল করা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আম্‌রা চাষ করি আনন্দে

—রবীন্দ্রনাথ।

প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখতে পেয়েছি যে নানা কারণে আগে হতে চাষীর অবস্থার অবনতি হয়েছে। তা ছাড়া সেই সব মূল কারণ হতে উদ্ভূত আরও অনেক কারণে (যেমন কৃষিঋণ) চাষার অবস্থা ভীষণ ভাবে মন্দের দিকে এগিয়ে চলেছে। আমেরিকায় এক একজন চাষী লক্ষপতি ; তাদের জমির এ পার হতে ওপার পর্য্যন্ত অনেক জায়গায় রেলগাড়ী বসান আছে। তাতে যাতায়াতের কাজ চলে—আবার জিনিষপত্র বাজারে পাঠাবার কাজও চলে। অনেকদিন আগে শ্রীযুত ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় কোন একটী পত্রিকায় এর একটা চমৎকার বর্ণনা দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশে চাষী লক্ষপতি হওয়া দূরে থাক্, কোন রকমে বেঁচে থাকার জন্যে তাকে প্রাণপাত পরিশ্রম কর্‌তে হয়। সে যখন জন্মায়, তখনই তার কাঁধে পৈত্রিক দেনা চাপে। তারপর সে যখন বড়

হয়, তখন সে পৈত্রিক দেনা শোধের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে, কিন্তু প্রায়ই বিফল হয়ে সে আবার দেনা কর্‌তে বাধ্য হয়। তা ছাড়া তার জমি হতে লাভও কমে গিয়েছে। আরও নানা কারণে তার অবস্থা খারাপ হয়ে অবশেষে সে যখন মারা যায় তখন দেখা যায় যে তার জীবনকালে সংসার ধ্বংসের দিকে আর এক ধাপ এগিয়ে এসেছে। এই রকমে ক্রমশঃ চাষীর অবস্থা খারাপ হতে খারাপ হয়ে চলেছে—এখন এরকম অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে যে মনে হয় যেন অবস্থার প্রতিকার করা দুঃসাধ্য।

সেই জন্যে চাষীর বর্ত্তমান অবস্থা আর তার প্রতিকারের উপায় আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বিষয়টীকে চারভাগে ভাগ করে নেব।

যে কোন জিনিষ উৎপন্ন কর্‌তে গেলেই দেখা যায় যে চারটী জিনিষের প্রয়োজন ঃ— ১। জমি ২। চাষী ৩। টাকাকড়ি, আর, ৪। জিনিষ বিক্রির বন্দোবস্ত।

জমি বল্‌তে আমরা বিশেষজ্ঞদের মতে এই "প্রকৃতির দান" অর্থই ধরে নেব। সেইজন্য জমির কথা বল্‌তে গিয়ে আমরা চাষের জমির কি অবস্থা হয়েছে তার উন্নতির জন্য কি করা যেতে পারে—জমির নানারকম সমস্যা—বহুভাগ, জলসেচ ইত্যাদি বিষয় আলোচনা কর্‌ব।

চাষী বলতে আমরা চাষীর চাষবাসের উপায়, ধরণ-ধারণ,

কিসে তার পরিশ্রম-শক্তি বাড়ে, কেন তার শক্তি কম্‌ছে ইত্যাদি নানা কথার আলোচনা কর্‌ব।

টাকাকড়ির সম্পর্কে, চাষবাসে কি পরিমাণ টাকাকড়ির দরকার, চাষী সে টাকা যোগাড় করে উঠতে পারে কিনা, কেন তার ঋণ হয়েছে—কি উপায়ে সে তার প্রয়োজনীয় টাকা-কড়ি সংগ্রহ কর্‌তে পারে—সে বিষয়ে আলোচনা কর্‌ব।

আর তার পরে জিনিষ বিক্রির বন্দোবস্ত। এর মধ্যে কেন ঠিক সময়ে ঠিক বাজারে ফসল না নিয়ে যেতে পারার জন্যে চাষীর লাভ হয় না, কি উপায়ে সে তার ফসল ঠিকমতো বিক্রির বন্দোবস্ত করতে পার্‌বে, কি উপায় অবলম্বন কর্‌লে তাকে অল্পদরে ফসল বেচে দিতে বাধ্য হতে হবে না—সেইসব কথা আলোচনা করব।

মোটামুটি এই চারদিক হতে চাষার অবস্থা বিবেচনা করে তারপর তার অবস্থা সম্বন্ধে আমরা সাধাণভাবে আরও দুচারটী কথা বল্‌তে চেষ্টা করব। এই ছোট পুস্তকের উদ্দেশ্য এইটুকুই।

১। জমি

নদী-মাতৃক বাংলাদেশে যে কোনদিন জমির কোন সমস্যা দেখা দেবে এটা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে আজ সোনার বাংলায় জমির সমস্যা এসে দেখা দিয়েছে। সাধারণতঃ এই জমির সমস্যা তিন দিক দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

আমাদের জমির উন্নতি করার কোন চেষ্টা না থাকায় জমি

ক্রমশঃই খারাপের দিকে এগিয়ে চলেছে। আমাদের বোধহয় যে দিন জমি নদীগর্ভ হতে উঠেছিল সেদিন হতে তার উন্নতির জন্যে চাষার পক্ষ হতে কোনও চেষ্টাই করা হয়নি। জমির নিজের স্বাভাবিক উর্ব্বরতাতেই এতদিন ফসল হয়ে এসেছে। চেষ্টা করে জমির উন্নতি করার চিন্তা বোধহয় বাঙালী চাষা তেমন করে কখনও করেনি।

কিন্তু এর যে কুফল হয়নি তা নয়—জমির উন্নতির যথেষ্ট দরকার হয়ে পড়েছে। সে উন্নতির অর্থ হ'চ্ছে যে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়েছে—জমি বেড়া দিয়ে ঘিরে জীবজন্তুর অত্যাচার হতে বাঁচানর দরকার হয়েছে—এক কথায় ইংরাজীতে যাকে **permanent improvement** (চিরস্থায়ী উন্নতি) বলা হয় তারই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

অনেক গ্রামেই দেখা যায় যে পল্লীর সমস্ত জমির একপাশে গ্রাম, আর তারপরে সেই গ্রামের চাষের জমি। সাধারণতঃ বসতি একটু উঁচু জায়গাতেই হয়—জন-বসতির চেয়ে চাষের জমি নীচু হয়। পূর্ব্ববঙ্গে এটা সুস্পষ্ট। একখানি টিলার উপরে গ্রাম আর সেই টিলার নীচে চাষজমি। সেইজন্য সেখানে সহজেই চাষের জমি জলে ডুবে যায়।

আমাদের ধান চাষে বা পাটচাষে যথেষ্ট জলের প্রয়োজন। সেইজন্যে জমিতে যদি প্রচুর পরিমাণে জল থাকে তা হলে ধানের বা পাটের চাষের পক্ষে সেটা ভালই। কিন্তু সময়ে সময়ে

দেখা যায় যে ধান যখন ছোট রয়েছে সে সময় হঠাৎ বেশী জল ঢুকে সে ধান ডুবিয়ে দিলে। ফলে সে ধানের বাড় হওয়া দূরে থাক্—ধান পচে নষ্ট হয়ে গেল। এ দুর্দ্দশা পূর্ব্ববঙ্গ বা যেখানে বেশী নীচু জায়গা আছে সেইখানেই দেখা যায়।

হয়তো কোন অর্দ্ধশুষ্ক বিলের মধ্যে ধান হয়েছে,—চারপাশের জমির চেয়ে সে বিল নীচু। কেবল একটা জায়গা দিয়ে সে বিলে বাইরের জল আসার রাস্তা আছে। যখন হঠাৎ বেশী জল এসে সেই বিলে ঢোকে তখনই ধান নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। এখন চাষীরা যদি সেই জল আসার রাস্তায় বাঁধ দিয়ে ইচ্ছামত জল আনার বন্দোবস্ত করতে পারে তাহলে তাদের ধান খুব ভাল হবে আশা করা যায়। এটা কার্য্যতঃও দেখা গিয়াছে। ঢাকার কাছে একটী গ্রামে একটা রাস্তা দিয়ে জল ঢুকে সারা জমির ধানের সর্ব্বনাশ করতো। কিন্তু গ্রামবাসী চাষীরা সেই রাস্তায় বাঁধ দিয়ে জল আসা নিয়ন্ত্রিত করায় তাদের গ্রামের অপূর্ব্ব উন্নতি হয়েছে—এবং আর কোনবার সেখানে ধান নষ্ট হয় না।

কোন কোন জায়গায় বিশেষতঃ পশ্চিম বাংলায়—বর্দ্ধমান বা বীরভূমে (যেখানে অনেকটা বিহারের মতো জমি) উঁচু জায়গা হতে জল নেমে এসে চাষ জমির উপরে পড়ে। সেখানে নীচে বাঁধ দিয়ে জল সঞ্চিত করে রাখা দরকার। পাহাড়ে জায়গায় যে রকম চাষ হয় তা সেখানে অবলম্বন করতে হবে।

আবার কোন জায়গায় এর ঠিক উল্টো ব্যবস্থা। হয়তো কোন একটা নীচু জমির পাশে বাঁধের জন্য নীচু জমির জল বাইরে বার করে দেওয়া দরকার। তা না হলে নীচু জমিতে চাষবাস করা দূরে থাক্ চারদিক্ অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠবে। কাজেই সেখানে অন্যান্য গ্রামবাসীদের কিছু ক্ষতি স্বীকার করেও সে বাঁধ কেটে দেওয়া উচিত। তা না হলে সে জমিটা তো বৃথা যাবে তাতে সন্দেহ নেই,—আর তার চেয়ে আরও বড়ো কথা এই যে গ্রামের স্বাস্থ্য নষ্ট হবে।

যেখানে শূকর হরিণের উৎপাত রয়েছে সেখানে চাষের জমির চারপাশ বেড়া দিয়ে ঘেরা উচিত। বাংলার চাষীরা হয়তো একথা শুনে হাস্‌বে। কিন্তু আমরা যদি সমগ্র ভারতবর্ষে জীবজন্তুতে কতো ফসল নষ্ট করে তার হিসাব নি তা হলে আমাদের স্তম্ভিত হতে হয়। সেই অনুপাতে বাংলার ফসলও জীবজন্তুর উৎপাতে বড় কম নষ্ট হয় না। আর তা ছাড়া আর একটা সুবিধা রয়েছে যে বেড়া একটু ব্যয়সাধ্য হলেও জমি অনবরত আল দিয়ে ভাগ করায় জমি যতটা নষ্ট হয়, বেড়া দিয়ে ভাগ কর্‌লে তা হতে অনেক কম জমি নষ্ট হবে। আমাদের জমিতে এত বেশী আল পড়ে যে বেড়া দিলে যে নেহাৎ কম জমি বাঁচবে তা মনে হয় না।

জমিতে যে রকম জলসেচনের দরকার তেমনি যেখানে জল জমে রয়েছে সেখানে জল নিকাশের ব্যবস্থা করা আরও

বেশী দরকার। বহু জায়গায় এমন জল জমে থাকে যে সেখানে চাষ হতে পারে না। জল জমে থাকায় পাঞ্জাবে ১২৫০০০ একর জমিতে চাষ বন্ধ হয়েছে। বোম্বাই প্রদেশের নিরা উপত্যকাতেও এই রকম জল ওঠায় আর জমি নোনা হওয়ায় চাষ হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। পুরীর চিল্কা হ্রদের ধারে স্থানে স্থানে জমি জল জমার জন্য এত নোনা যে সেখানে চাষ চল্‌ছে না। বাংলার কোন হিসাব নেওয়া হয় নি যে জল জমে থাকায় কতো জমিতে চাষ বাস বন্ধ হয়েছে। কিন্তু কল্‌কাতা হতে কিছু দূরেই মহিষবাথান ইত্যাদি অঞ্চলে গেলেই ধারণা হয় কত বিস্তীর্ণ মাঠ নোনা হওয়ায় চাষের অযোগ্য হয়ে পড়ে আছে।

বাংলা দেশে কৃষির উপর নির্ভরশীল লোক সংখ্যার তুলনায় জমি অল্প। সেই জন্য চাষীর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যে যেন এক টুক্‌রা জমিও বৃথা না পড়ে থাকে। কিন্তু তার তুলনায় এখনও যথেষ্ট জমি বেকাজে পড়ে রয়েছে।

এই জল জমা বা মাটী হ'তে জল উঠা নিবারণের একমাত্র উপায় নিকাশের ব্যবস্থা করা। সে নিকাশ দুরকম হতে পারে। এক মাটির উপর দিয়ে ড্রেন করে জল নিকাশের ব্যবস্থা করা, আর দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে মাটির ভেতর ড্রেন পাইপ বসিয়ে মাটি হতে যে জল ওঠে সেই জল বার করে দেওয়া। এ জিনিষটা এমন কিছু শক্ত নয়। যে সব জায়গায় জল ওঠে সে সব জায়গায় মাটির তলায় কতকগুলি ড্রেন পাইপ বসিয়ে দিতে হবে; অবশ্য সে

বসাবার একটু কায়দা আছে। কিন্তু মোটের উপর সেই পাইপ গুলি বসালেই মাটীর তলার জল মাটির নীচের ড্রেন দিয়ে দূরে চলে যাবে, মাটিটাকে ভিজিয়ে উপরে উঠবে না। এতে সর্ব্বদা জমিটা সরসও থাক্‌বে, অথচ জমি জলা বা নোনা হবে না। এই রকম উপায়ে সরকারী ফার্ম্মে অনেক জায়গায় নোনা বা জলা জমির জল ওঠা বন্ধ করে খুব ভাল চাষের জমি তৈরী করা হয়েছে। এই দুই উপায়ের মধ্যে দ্বিতীয়টীই বেশী কাজের।

ওদেশেও এই প্রণালীটাই বেশী চলে, আর কার্য্যকারিতার জন্য বিশেষজ্ঞেরাও এই প্রণালীটাকেই পছন্দ করেন। হয়তো অনেকে বলিবেন যে মাটির নীচে ড্রেন পাইপ করার সামর্থ্য আমাদের চাষীর কোথায়? কিন্তু একটী জমি উন্নত হলে সে চিরকাল যে লাভটী দেবে, সেই লাভের তুলনায় প্রথম খরচটী কিছুই নয়।

প্রায়ই দেখা যায় যে অনেক সময় প্রথম টাকাটা দেওয়াই চাষীর পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়ে। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে কিছু টাকার সংস্থান হলেও লোক-বলের অভাবে কোন কাজ হয়ে ওঠে না। এসব জায়গায় চাষীর কর্ত্তব্য হচ্ছে সম্মিলিত হয়ে সমবায়-সমিতি স্থাপনা করা। সমবায় সমিতি নামটী শুন্‌তে বৃহৎ। সাধারণতঃ মনে হবে যে অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত চাষী কি করে বড় বড় হিসাব কেতাবযুক্ত সঙ্ঘ স্থাপনা কর্‌বে? কথাটাও সত্য, সেই জন্য আমার মনে হয় হঠাৎ এ সব কাজের জন্যে পশ্চিম হতে

আমদানী (Co-operative organisation) সমবায়সঙ্ঘ না করে আমাদের গ্রামে গ্রামে যেমন পঞ্চায়েৎ চলে আসছে সেই রকম ধরণের একটা সমিতি গড়ে তোলা। অবশ্য মূলতঃ জিনিষ দুটো একই; কিন্তু যদি বাহিরের চাল চলন সমস্ত এদেশী হয় তা হলে চাষীর পক্ষে সেটা গ্রহণ করা কষ্টকর হবে না।

জমির আর একটি সমস্যা এসে দাঁড়িয়েছে যে উত্তরাধিকারসূত্রে জমি ক্রমশঃ ভাগ হয়ে হয়ে এত ছোট হয়ে পড়েছে যে তাতে চাষ বাসের লোকসান হচ্ছে। তিন কাঠা জমির একটা ক্ষেত হয়ত পূর্ব্বধারে আর অন্য একটা ক্ষেতের পাঁচ কাঠা জমি হয়তো সেখান হতে দেড় মাইল দূরে; চাষীকে এখান হতে একবার চাষ দিয়ে আবার দেড় মাইল দূরে গিয়ে চাষ দিতে হবে। এতে তার শক্তি, সামর্থ্য, উৎসাহ, সময়—সকলেরই অপচয় হয়। আর তা' ছাড়া এখন প্রত্যেক চাষীর অংশে জমি গড়ে নিতান্তই অল্প। নীচে বিভিন্ন দেশে প্রত্যেক চাষীর ভাগে গড়পড়তা কতো জমি পড়ে তার একটি হিসাব দিচ্ছি।

ইংলণ্ড	৬২·০	একর
জার্ম্মানি	২১·৫	
ফরাসী	২০·৩	
ডেনমার্ক	৪০·০	
আমেরিকা যুক্ত-প্রদেশ	১৪৮·০	

জাপান	৩·০	একর
ভারত	২·৩	,,

ভারতবর্ষের মধ্যে আবার বিভিন্ন প্রদেশে কি রকম গড় পড়ে তারও একটা তুলনা দরকার।

বোম্বাই	১২·২	একর
পাঞ্জাব	৯·২	,,
মধ্যপ্রদেশ	৮·৫	,,
মাদ্রাজ	৪·৯	,,
বাংলা	৩·১	,,

কিন্তু বাংলা সম্বন্ধে একটা সাধারণ নিয়ম ধরে দিলেই হবে না। বিভিন্ন জেলাতে আবার এতো কম বেশী আছে যে তার সঙ্গে একটু পরিচয় থাকা প্রয়োজন।

পশ্চিম বঙ্গ	বাঁকুড়া	১·৯
	মেদিনীপুর	১·৩
উত্তর বঙ্গ	ময়মনসিংহ	২ ৭
	রাজসাহী	২·২

কাজেই দেখি বাংলার বিভিন্ন অংশে তারতম্য রয়েছে 'কিন্তু যাই হোক্ বাংলার জমি এত ছোটো ছোটো হয়ে প'ড়েছে আর সংলগ্ন না হয়ে দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়েছে যে তাতে আমাদের চাষীর লোক্‌সান হচ্ছে।

পাঞ্জাবেও এই সমস্যা ছিল। কিন্তু সেখানে এক সুন্দর উপায়ে এ সমস্যার সমাধান হয়েছে। সেখানে সমবায় সঙ্ঘের একজন লোক ঘুরে ঘুরে একটী গ্রামের জমির মধ্যে কাকে কি রকম ভাবে জমি দিলে চাষের সুবিধা হয় সেটা ঠিক করেন। তারপর সেই মৎ-লব সেই জমির মধ্যে যার যার জমি পড়ে তাদের প্রত্যেককে দেখান হয়। তাদের মধ্যে যদি অন্ততঃ ২/৩ লোক (কোন কোন স্থানে ৩/৪) সেই রকম ভাবে জমি অদল বদলে রাজি হয় তা হলে সেই পরিকল্পনাকে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট চার বছরের জন্য কার্য্যকরী করেন। চার বছর পরে কার কি আপত্তি আছে সেটা জিজ্ঞাসা করা হয়। যদি আপত্তি না থাকে তবে সেই প্রণালীকে স্থায়ীভাবে চালান হয়। অবশ্য এটা খুব ধীরে ধীরে হয় কিন্তু যাই হোক্ নির্ব্বিবাদে শান্তিতে যদি এরকম উন্নতি হয় তবে সেটা অবশ্যই সাদরে বরণীয়।

বাংলায় এটা হওয়া বোধ হয় সম্ভব নয়। নানা রকম আইনে ভূমিস্বত্ব এখানে এমন জটিল হয়ে উঠেছে যে একটা কিছু পরিবর্ত্তন করতে গেলেই নানা দিক হতে এতো অসুবিধা হয়ে পড়ে যে কোন পরিবর্ত্তন করা সম্ভব হয়ে উঠে না। এখানে হয়ত একটি গ্রামের মধ্যে তিনটি জমিদার আছেন, এখন একজন হয়তো রাজি হলেন ; কিন্তু আর দু'জন যদি রাজি না হন তা হলে কি উপায় ? আর তাঁদের রাজি না হওয়ার কারণও যথেষ্ট রয়েছে। যদি এই পরিবর্ত্তনের ফলে তাঁদের জমিতে সমৃদ্ধিশালী প্রজা গিয়ে দুঃস্থ প্রজা

এসে পড়ে আর তাতে যদি তাঁদের আয় কমে যায় তবে সে আয় কমার জন্য দায়ী হবে কে? কিন্তু পাঞ্জাবে এরকম ভাবে জমিদারী আইন বা মহাজনী আইন বা ভূমিস্বত্ব বদলের আইন না থাকায় এটা সম্ভব হয়েছে। বাংলায় যদিও এখন এটা সম্ভব নয় বোঝা যাচ্ছে তবু আমাদের মনে হয় যে যদি কোন উপায়ে এরকম জমি অদল বদল করে চাষের উন্নতি হয়, তা হলে আমাদের চাষীর অবস্থা ফিরে যাবে।

যেখানে ইচ্ছা আছে সেই খানেই একটি না একটি উপায় দেখা যায়। আমার মনে হয় চাষী আর জমিদার মিলিত হয়ে এ সম্পর্কে কোন চেষ্টা করেন তা হলে এমন কোন একটি উপায় দেখা দেবে যাতে সম্পূর্ণ ভাবে না হোক্ অন্ততঃ আংশিক ভাবে এ সমস্যার কোন সমাধান হবে বলে আশা করা যায়। আর তা ছাড়া চাষীরাও মিলে মিশে এরকম চেষ্টা কর্‌তে পারে; তারা ইচ্ছা কর্‌লে নিজেদের মধ্যে দেখে শুনে জমি অদল বদল করে নিতে পারে। তবে এরকম মিলে মিশে এ প্রচেষ্টা কত দূর সফল হবে তা বলা কঠিন। প্রায়ই দেখা যায় যে কোন একটা শক্তি এসে চাপ দিয়ে না করিয়ে নিলে এরকম কাজ সফল হয় না। সেই জন্যে মনে হয় যতদিন সরকার এটাকে করাবেন না ততোদিন এটা সফল হবে না।

জমির তৃতীয় সমস্যা হচ্ছে জল-সেচের সমস্যা। অনেকেরই ধারণা যে এই নদী-ভরা বাংলা দেশে আবার জলসেচের কি

দরকার। যেখানে জমির উপরে জল জমে থাকে সেখানে জল সেচের কথাটা নিতান্তই হাস্যকর।

আপাত-দৃষ্টিতে দেখলে এই কথাটাই সত্য বলে মনে হয়। কিন্তু যদি আমরা একটু ভেবে দেখি, তা'হলে দেখতে পাব যে জলসেচের সমস্যা বাংলায় রয়েছে। এটা সত্যি কথা যে সাধারণতঃ বর্ষাকালে প্রচুর জল পাওয়া যায় আর সে সময় জলসেচের ততো বেশী দরকার হয় না। কিন্তু অন্য সময় বৃষ্টিপাত যথেষ্ট বলে মনে হয় না। নীচে বাংলার সারা বছরে কখন কতো বৃষ্টিপাত হয় তার একটা হিসাব দিচ্ছি।

জানুয়ারী	·৩ ইঞ্চি	জুলাই	১৫·৪ ইঞ্চি
ফেব্রুয়ারী	·৯ ,,	আগষ্ট	১৪·৬ ,,
মার্চ্চ	১·৬ ,,	সেপ্টেম্বর	১০·৯ ,,
এপ্রিল	৩·৩ ,,	অক্টোবর	৫·০ ,,
মে	৭·৬ ,,	নভেম্বর	·৮ ,,
জুন	১৪·৬ ,,	ডিসেম্বর	·১ ,,

এই হতেই বোঝা যায় যে জুলাই বা আগষ্ট মাসে যেখানে ১৫ ইঞ্চি জল প্রচুর বলে মনে হয়, অন্যান্য মাসে ১ ইঞ্চি বা তারো কম জল প্রচুর বলে মনে হয়না।

তা ছাড়া বাংলাতেও যে জলসেচের অভাব রয়েছে এবং জলসেচের প্রয়োজন যে রয়েছে—তার কতকগুলি প্রমাণ দিচ্ছি। ধান বা আখ চাষে বরাবর জলের সমান সরবরাহ চাই। হঠাৎ

এক সময়ে খানিকটা জলে এসব চাষ চলে না। প্রথম অবস্থা হতে আরম্ভ করে বহুদিন পর্য্যন্ত এদের সমান ভাবে জলের প্রয়োজন। সেইজন্যে আখ চাষে চৈত্র বৈশাখ মাস হতে আরম্ভ করে প্রায় কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত জলের দরকার। কিন্তু এই কয়মাসের মধ্যে মোটে আমরা দু' তিনমাস বর্ষার জল পাই। এইজন্যে জলসেচের প্রয়োজন। শুধু আখ নয়—আরও অন্যান্য চাষের জন্যে সারাবছর ধরে জলের সরবরাহের বন্দোবস্ত থাকা দরকার।

ক্রমশঃ আমাদের দেশে লোক সংখ্যা যে রকম বেড়ে চলেছে তাতে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—যে জমিতে দুটো ফসল না হলে উপায় নেই। জমিতে সারা বছরে কেবল একটা ফসল হলে আর চলে না। কিন্তু জলসেচের বন্দোবস্ত না থাকলে জমি দোফসলী করা অসম্ভব। ডিসেম্বর হতে জুন মাস পর্য্যন্ত বৃষ্টিপাত নিতান্ত কম এবং তাতে একটি ফসল হতে পারে বলে বোধ হয় না। সেই জন্যে জমি দোফসলী করতে হ'লে জল-সেচের এখনও প্রচুর দরকার। আমাদের ধনধান্যে পুষ্পেভরা বাংলায় প্রকৃতি দেবী নানা বৈচিত্র্যের সমাবেশ করেছেন। এই সুজলা সুফলা দেশের মধ্যেই আবহাওয়া কোথাও বা রুদ্র কঠোর, আবার কোথাও বা সুকোমল। পশ্চিম বাংলা বা উত্তর বাংলা জলে ভাসা পূর্ব্ব বাংলার মতো নয়। বর্দ্ধমান জেলার পশ্চিমাংশে অর্থাৎ রাণীগঞ্জ, মানকর ইত্যাদি স্থানে যিনি এক বছর থেকেছেন, তিনিই জানেন যে নামে বাংলার মধ্যে হলেও কার্য্যতঃ এ সব

জায়গার জল হাওয়া ঠিক বিহারের মতোই। আর মুর্শিদাবাদ বীরভূমের উত্তরাংশ, বাঁকুড়ার এবং মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশ, দিনাজপুর মালদহের বহু অংশ, ময়মনসিংহ ও পাবনার অংশ বিশেষ—এ সমস্ত জায়গায় জলের অভাবে উপযুক্ত পরিমাণে চাষ হচ্ছে না। আর পার্ব্বত্য ত্রিপুরা এবং পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম এখন প্রায় জঙ্গল হয়ে রয়েছে। কিন্তু এই দুই জেলার যে সব জায়গা একেবারে পাহাড় নয় সেখানে জল সেচের ব্যবস্থা হলে আশা করা যায় যে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হবে।

যেখানে এখন জলাভাব নেই সেখানেও আমাদের জলসেচের বন্দোবস্ত রাখা প্রয়োজন। লোক সংখ্যার বৃদ্ধির জন্য এখন প্রত্যেক জমিতে যাতে বেশী ফসল হয় তার চেষ্টা দরকার, আর সে জন্য জলসেচের দরকার।

যেখানে শতকরা আশীজন লোক কৃষির উপর নির্ভর করছে সেখানে কেবল দৈববৃষ্টির উপর ভরসা করে থাকা কোন সদ্‌বুদ্ধি নয়। যদি কোনবার বৃষ্টি না হয় তবে সমস্ত দেশে হাহাকার পড়ে যাবে। সেই জন্যে যাতে বৃষ্টি না হলেও চাষবাস নির্ব্বিঘ্নে চল্‌তে পারে, তার জন্য জলসেচের প্রয়োজন। এই জলসেচ ধনোৎপাদক (Productive) না হলেও ধন ও শস্য রক্ষক (Protective) হিসাবে বাঞ্ছণীয়।

কিন্তু যাই হোক্ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে জলসেচের প্রয়োজন বাংলায় যথেষ্ট রয়েছে। এখন কি রকমে এই জলসেচ হতে

পারে সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলে আমরা এই অধ্যায় শেষ কর্‌ব।

জলসেচ তিন রকম উপায়ে হ'তে পারে। প্রথমতঃ খাল দ্বারা ; দ্বিতীয়তঃ পুকুর দ্বারা ; তৃতীয়তঃ কুয়া দ্বারা। প্রথমে খাল বা ক্যানালের কথা আলোচনা কর্‌লে দেখতে পাওয়া যাবে যে ক্যানেল সাধারণতঃ সরকারের সাহায্য ভিন্ন হয় না। কিন্তু বাংলার দুর্ভাগ্য বশতঃ বাংলায় সরকার এ দিকে বেশী খরচ করেন নাই। নীচে বাংলা আর অন্যান্য প্রদেশে সরকারের ক্যানেলের দ্বারা সেচ প্রাপ্ত জমির তুলনামূলক হিসাব হতে এটা স্পষ্ট হবে।

সরকারী ক্যানেল জলসিক্ত জমি—(একর)

মাদ্রাজ	বোম্বাই	বাংলা
৩,৭৩০,৩৯০	৩,১৬১,৭৩২	৬৩,৬৪৪

কিন্তু বাংলায় আরো জলসেচের প্রয়োজন আছে, তার প্রমাণ যে বাঙালীরা বে-সরকারী চেষ্টায় যে ক্যানেল কেটেছে তা অন্য দেশের তুলনায় ঢের বেশী। বাঙালীরা বুঝেচে যে জলসেচের দরকার। সেই জন্যই তাদের এ উৎসাহ ; তা নইলে তারা সখ করে বিনা কাজে ক্যানাল কাটেনি।

বে-সরকারী ক্যানালের জলসিক্ত জমি (একর)

মাদ্রাজ	বোম্বাই	বাংলা
১,৪,৭,৩২৬	৮৯,২৩৪	২,০৬৭৫৭

এই হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে জলসেচের দরকার থাকা

সত্ত্বেও সরকার এতে হাত দেন্ নি এবং সেই জন্যেই বাঙালীকে বাধ্য হয়ে এই ভার নিতে হয়েছে। সরকারের এই ঔদাসীন্যের কারণ বুঝি না। যাই হোক্ এই রকম বে-সরকারী প্রচেষ্টার মধ্যে সফল হয়েছে, বীরভূমের ও বাঁকুড়ার ক্যানেল—যেগুলি গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের উৎসাহে হয়েছিল। আর এখনও সফল হয় নি তবে জল্পনা চলেছে, এ রকম অনেক গুলির মধ্যে একটির উল্লেখ কর্‌ছি সেটা বীরভূম জেলায় ময়ূরাক্ষী হতে দাদপুর-ডাউকী ক্যানেলের কল্পনা।

এই সব দেখে সরকারের উচিত হচ্ছে ক্যানেল আরও বাড়ান। আর বাংলার কৃষি-নির্ভরশীল জনসংখ্যার কর্ত্তব্য হচ্ছে বে-সরকারী চেষ্টায় ক্যানেল আরও বাড়ান। এতে কেবল মাত্র চাষীদের চেষ্টা থাকলেই চল্‌বে না, যাঁরা অন্যান্যভাবে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কৃষির উপর নির্ভর করেন তাঁদেরও সাহায্য দরকার।

বেসরকারী ভাবে কেবল ছোট ছোট ক্যানেল নয়, বেশ বড় ক্যানেল সমবায়-প্রথায় করা সর্ব্বপ্রথম বাংলাতেই সম্ভব হয়েছে, আর তাই এটা বাংলার নিজস্ব। সেই জন্যে এ সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বল্‌ব না।

আর যে দু'উপায়ে জমিতে জল সেচ হয় সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা দরকার। পুকুর থেকে জলের বন্দোবস্তই সবচেয়ে সহজ। কিন্তু বাংলার পুকুর মজে যাওয়ায় অনেক জায়গায় জলাভাব হয়ে পড়েছে। যদি সেখানে জমিদার বা

অন্য কেউ পুকুর কেটে দেন তবে ভালই। আর যদি সে রকম কোন কিছু সম্ভব না হয় তবে চাষীরা নিজের উৎসাহে পুকুর কেটে নিজেদের জলাভাব দূর কর্‌তে পারে। আর এটা যে খুব একটা কঠিন কাজ তা নয়। গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি হওয়ায় আগে চাষীদের বিশেষ কোন কাজ থাকে না। আর সেই সময় হ'ল পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করারই প্রকৃষ্ট সময়। এই সময় যদি সমস্ত চাষী মিলে একটা পুকুর কেটে ফেলে তা হলে তাদের জলকষ্ট এবং জমিতে দেবার জলের অভাব দূর হয়।

কুয়া সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বল্‌তে পারা যায়। চাষীরা মিলিত হয়ে তাদের প্রয়োজন মত কুয়া খুঁড়ে নিতে পারে, আর বাংলা দেশে কুয়া ততো ব্যয়-সাধ্য নয়, মাত্র কয়েকজন চাষীর সম্মিলিত চেষ্টাতেই একটী কুয়ো হতে পারে।

বিহারের সীমায় বাংলার যে জমি আর উত্তর বাংলায় কুয়া দিয়ে জলসেচের ব্যবস্থাই বেশী যুক্তি-যুক্ত এবং ঐ সব অঞ্চলে কুয়ার বহু প্রসার বাঞ্ছনীয় মনে করি।

চব্বিশ-পরগণা, যশোর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর এবং হাওড়া, হুগলীর কিছু অংশ—এসব জায়গায় কুয়ায় চেয়ে পুকুরেই বেশী সুবিধা। এখানে মাটী অপেক্ষাকৃত নরম, আর সেই জন্য এখানে পুকুরেই অধিকতর লাভ।

পুকুর হতে জল তোলার কোন সহজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কোন কথা বলা সম্ভব নয়। প্রত্যেক জায়গায় অবস্থা বুঝে

ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু কুয়ো সম্বন্ধে একটা কথা বোধ হয় বলা যায়। অবশ্য সকলের পক্ষে নয়, কিন্তু যাঁর সঙ্গতি আছে তিনি যেন **persion wheel** ব্যবহার করেন। এটা হাতেই চলে কিন্তু জল ওঠে প্রচুর। পাঞ্জাবে ইহার বহু প্রচল হয়েছে। এই ধরণের একটার নাম হচ্ছে বারস পাম্প, লেসলির তৈরী করা। এক ঘণ্টায় একটা পাম্পে জল ওঠে ৯০০ গ্যালন। একটা সাধারণ মানুষ কুয়ো হতে এক ঘণ্টায় জল তোলে ১০০ গ্যালন। আর অন্যান্য পাম্পের তুলনায় এ পাম্পের দামও সস্তা হয়েছে। বোধ হয় টাকা সত্তর এর দাম। তা হলেই দেখা যাবে যে এ পাম্পে আমরা লাভবান হব বেশী রকমেই। যিনি এ পাম্প বসাতে পারবেন তিনি যেন এটা অবহেলা না করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

কৃষিঋণ ও কৃষির অর্থ সরবরাহ।

যার ধন তার ধন নয়, যাহার মাথার কালঘাম ছুটিয়া ফসল জন্মে লাভের ভাগে সে কেহ হইল না। বঙ্কিমচন্দ্র।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা চাষে প্রকৃতির কাছ থেকে যেটকু দান পেয়েছি তার সম্বন্ধে কতকগুলি সমস্যার আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি। চাষে দুটো দিক খুব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে—এক হচ্ছে প্রকৃতিদেবীর কাছ থেকে যেটুকু দান পাওয়া গেছে যেমন জমি, আলো, হাওয়া, নদীর জল, বৃষ্টির জল ইত্যাদি—; আর একটা দিক হচ্ছে—মানুষের চেষ্টার দিক্। এই দিকের মধ্যে আমরা জমি চাষ, তার উন্নতির চেষ্টা, সেচ, সার হ'তে আরম্ভ করে ফসল বাজারে বিক্রি হওয়া পর্য্যন্ত সমস্তই বুঝি। পূর্ব্বে প্রথম দিকটা আলোচিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে আমরা চাষীর অন্যান্য দিক ছেড়ে দিয়ে চাষীর আর্থিক অবস্থা, আয়, আর দেনার কথাই আলোচনা কর্‌ব।

বাংলার চাষীর আর্থিক অবস্থা এক কথায় বল্‌তে গেলে নিতান্তই মন্দ হয়ে পড়েছে। পূর্ব্বেই বলা গেছে যে সাধারণতঃ বাংলার প্রতি চাষীর জমি গড়ে ৩ একর। বাংলার জমিতে সাধারণতঃ ধান বা পাট হয়ে থাকে—অন্যান্য জিনিষ খুব কমই হয়। এখন সরকারী এক অধুনা-প্রকাশিত রিপোর্টে পাওয়া যাচ্ছে যে সাধারণতঃ ৩ একর জমিতে ৫৪ মণ ধান বা ৪৮ মণ পাট হয়। এখন যদি কিছুদিন পূর্ব্বেরও হিসাব নি যখন চাল কিছু আক্রা ছিল তখনও দেখি যে ৫৪ মণ ধানের দাম হত ৫৪ × ৪ = ২১৬৲ (১৯৩১) যদি পাটের জমি হতো তবে ৪৮ মণ পাটের দাম হত ৫৪ × ৩½ = ১৬৮৲।* কিন্তু বছরে চাষীর খরচ হিসাব করে দেখা গেছে, ৪২০৲ টাকার কম নয়। এখন চাষার জমি ছাড়া অন্য কিছু সম্পত্তি নাই। তার প্রধান আয় জমি হতেই। কাজেই কি করে যে চাষা তার খরচ চালাবে তার কোন উপায়ই নির্দ্দেশ করা যেন অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তার খরচ ৪২০৲ টাকার মধ্যে, সে জমি হতে পায় মাত্র ২১৬৲ টাকা বা ১৬৮৲ টাকা। বাকী টাকা যে সে কি করে সংগ্রহ করবে—তা বলা যায় না। সেই জন্যেই চাষী ধার করতে বাধ্য হয়ে পড়ে।

আগে বাংলায় এরকম অবস্থা এসে দাঁড়ায় নি। খরচের দিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে আগে জীবনযাত্রা এতো ব্যয়সাধ্য না হওয়ার খরচ যথেষ্ট কম ছিল। আর আয়ের দিক দিয়ে দেখতে

---

‡ Bulletin, Bengal Board of Economic Enquiry.

গেলে তখন জমির উর্ব্বরতা বেশী থাকায় আর ধান বা পাটের দর থাকায় বাংলার চাষীর ঘরে অর্থ ছিল—তার দৈন্য-দশা তখন দেখা দেয় নি।

কিন্তু গত মহাযুদ্ধের পর যখন সমস্ত জগতের অর্থনৈতিক আবহাওয়া বদ্‌লে গেল তখন হতেই চাষার ভাগ্যের দ্রুত পরিবর্ত্তন দেখা দিতে সুরু হল! সমস্ত জগতে একটা বিপর্য্যস্ত ভাব এসে পড়ল—যেন সমস্ত জগতেই একটা অর্থনৈতিক সঙ্কট এসে উপস্থিত হল। যে সব জিনিষের দাম যুদ্ধে অত্যন্ত বেড়েছিল, সেইসব জিনিষেরই চাষ এতদিন সব দেশে হচ্ছিল। যুদ্ধের পর সেইসব জিনিষের হঠাৎ দাম পড়ে যাওয়ায় সমস্ত দেশেরই অর্থাগম বহু পরিমাণে বন্ধ হয়ে গেল।

বাংলাও এই দুর্দ্দশা হতে বাদ যায় নি। যুদ্ধের সময় পাটের দর অসম্ভব চড়েছিল। এমন কি ১৮৲ পর্য্যন্ত মণের দর হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ যখন সেই পাটের দর ৩৸৹ টাকায় পড়ে গেল তখন বাংলার চাষীর অবস্থা শোচনীয় হ'য়ে পড়ল।

অবশ্য এ পাটের দর খুব বেশী দিন পড়ে নি, আর এই পাটের দর কমাই যে বাংলার চাষীর দুর্ভাগ্যের একমাত্র কারণ তা নয়। বহু পূর্ব্বেই চাষীর দুর্ভাগ্যের সূচনা হয়েছে। তবু এই পাটের দর কমাতে চাষীর দুর্ভাগ্যটা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠায় বোঝা গিয়াছে যে এই পাটই তাদের প্রধান অবলম্বন ছিল—আর সেই অবলম্বনের অভাবেই তাদের এই দুর্দ্দশা!

চাষীর ঋণ বাড়ার আরও একটা কারণ সে সময়ে ঘটেছিল। এই সময়েই শর্দ্দাবিল পাশ হওয়ার ভয়ে বহু চাষী তার শিশু অপোগণ্ড সন্তানদের পর্য্যন্ত বিবাহ দিয়াছিল। সেই অস্বাভাবিক বিবাহে সাধারণ ব্যয় অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যয় হওয়ার সম্ভব। আর তা ছাড়া সাধারণ বিবাহের সময় চাষীর অবস্থা যখন স্বচ্ছল থাকে তখনই বিবাহ হয়। কিন্তু এই সময়ে অর্থ স্বচ্ছল থাক্ আর নাই থাক্ তাকে ধার কর্জ্জ করেও বিবাহ দিতে হয়েছিল। সেই জন্য হঠাৎ চাষীর ঋণ খুব বেশী পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল। কিছু দিন পূর্ব্বে সরকার ঠিক করেছিলেন বাংলার চাষীর দেনার মোট পরিমাণ ১০০ কোটি। পরে এই সব ব্যাপারের পর সরকার বলেছেন শতকরা ৩০ ভাগ দেনা বেড়ে গেছে। অন্যান্য বেসরকারী মতে (যেমন ডাঃ নরেশ সেনগুপ্তের মত) * ধার শতকরা ৩০ ভাগ দূরের কথা ৩গুণ বেড়ে গিয়েছে। ১০০ কোটীর জায়গায় ৩০০ কোটী হয়েছে।

১০০ কোটী মোট দেনার পরিমাণ হলে গড়ে ১টী চাষী পরিবারের ধার হয় ১৬০৲। কিন্তু বছরে বছরে দেনার পরিমাণ

* ডাঃ নরেশ সেনগুপ্ত পৌষ, ১৩৪১ সালের "ভারতবর্ষে" দেখিয়েছেন যে পাটের দাম পড়ায়, সেই সময় শর্দ্দাবিল পাস হওয়ার আগে বহু বিবাহ হওয়ায়, টাকার দাম চড়ায় ও ঋণ পরিশোধের শক্তি হ্রাস হওয়ায় কৃষিঋণ অনেক পরিমাণে বেড়েছে। তাঁর মতে এখনকার কৃষিঋণ মোট প্রায় ৩০০ কোটী।

যে কি রকম ভাবে হু হু করে বেড়ে চলেছে, তা দেখ্‌লে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। নীচে একটা ছোট খাট হিসেব দিচ্ছি।

পাবনা, বাঁকুড়া আর ফরিদপুর জেলার খবর নিয়ে জানা গিয়েছে যে ১৯২৮ সালে পাবনা জেলায় চাষীর ধার ছিল—১০১৲ টাকা, কিন্তু ১৯৩৩ সালে সেই ধার বেড়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে ১৫৬৲ টাকা। ১৯২৮ সালে বাঁকুড়া জেলায় চাষীর ধার ছিল ১১৩৲। এখন সেই ধার ২২৪৲। ফরিদপুর জেলায় ধার ছিল ১৪৬৲ টাকা, কিন্তু সেই খানে ধার হয়ে দাঁড়িয়েছে ২১৭৲ টাকা। ফরিদপুর জেলায় চাষীর বছরে বাঁচে মোটে ৯৲। যার বাৎসরিক মুনাফা মোটে ৯৲ তার ৬ বৎসরে ৭১৲ টাকা ধার বাড়া বড় সোজা কথা নয়। এই হতেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে সে ধার শোধ করার সঙ্গতি চাষীর নেই—আর অদূর ভবিষ্যতে যে হবে তাও আশা করা যায় না।

চাষীর ধার হওয়াটাই যে এমন কোন একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার তা নয়। সব উন্নত দেশেই চাষীকে ধার দেবার জন্য বড় বড় ব্যাঙ্ক আছে। কিন্তু সে সব দেশে চাষী ধার নিয়ে শস্য উৎপাদনের চেষ্টা করে, সংসার খরচ করে না; আর সেই ধারে সে এত বেশী শস্য উৎপাদন করে নেয় যে, তাতে তার দেনা শোধ হয়েও প্রচুর লাভ থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের চাষীর ধার তো সে ধরণের নয়। আমাদের দেশের চাষী যখনই ধার করে তখনই বোঝা যায় যে সে দেনার টাকা এমন কোন কাজে লাগাতে পারবে না, যাতে তার দেনার টাকা উঠে আসে। এই

জন্যই আমাদের চাষীর দেনা ভয়ঙ্কর। দেনা মানেই তার সর্ব্বনাশ।

চাষীর জীবনযাত্রা আর গ্রামের অবস্থা বেশ ভাল করে আলোচনা কর্‌লে তার দেনার কতকগুলি কারণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। সব প্রথমেই চোখে পড়ে একটা সাধারণ কথা যে চাষীর আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী। তার যা সামান্য ব্যয় সেটা তার আরো সামান্য আয়ের তুলনায় যথেষ্ট বেশী। সেই জন্য তার দেনা অবশ্যম্ভাবী।

তার ধার কিসে কিসে হয় সেটার একটা সমালোচনা করা যাক্‌। সব প্রথম কথাই একটা বলতে পারা যায় যে চাষীর চিরন্তন দারিদ্র্যই এর কারণ। যখন তার উপর পর পর কয়েকটা ধাক্কা এসে পড়েছিল—তখন যদি তার সহায় সম্বল কিছু থাক্‌তো তা হ'লে হয়তো তার দেনার পরিমাণ এতটা বাড়তো না। বহুদিন থেকে সে অন্তঃসারশূন্য হওয়ায় সামান্য আঘাতেই সে দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। আঘাতের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবার সামান্য চেষ্টা না করেই সে আঘাতকে বহন করে নিতে বাধ্য হয়েছে।

এই যে দারিদ্র্য—এতে আমরা কেবল অর্থের দারিদ্র্যই বুঝবো না। আমাদের চাষীর মনের যে উৎসাহের দারিদ্র্য এসেছে হৃদয়ের সম্পদের যে দারিদ্র্য এসেছে সে দারিদ্র্যও বড় কম নয়। বাংলার চাষীর অস্থিমজ্জায় যে আত্ম-অবিশ্বাসের বিষ ছড়িয়ে গিয়েছে সে বিষ নষ্ট করা সহজ নয়। তাই সে সামনে আসন্ন

বিনাশ জেনেও ধার কর্‌তে ক্ষান্ত হতে পারে না, যেন অনেকটা বিকারগ্রস্ত রোগীর মত! এটা তাদের ঘোর মানসিক অস্বাস্থ্যের লক্ষণ।

কিন্তু এর চারিদিক না ভেবে কেবল চাষীকে দোষ দিলেই চল্‌বে না। এই মানসিক অস্বাস্থ্য যেমন কতকটা আর্থিক দুরবস্থার কারণ, তেমনি আবার আর্থিক দুরবস্থাও মানসিক অস্বাস্থ্যের কারণ। এর কোন্‌টা প্রথম দেখা দিয়াছিল আর কোন্‌টা যে কোন্‌টার কারণ, সেটা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কিন্তু যে কারণেই হোক্ আমাদের চাষীকে এ দুটোরই হাত ছাড়াতে হবে—তা না হলে উপায় নেই।

দ্বিতীয় কথা, আমরা বল্‌তে পারি যে বাংলাদেশে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে চাষ না হওয়ায় ফসলের কোন স্থিরতা নেই। চাষী আকাশের দিকে চেয়ে বসে রয়েছে। বৃষ্টি যদি হয় তবেই তার শস্য হবে। কিন্তু প্রকৃত জল-সেচের বন্দোবস্ত থাক্‌লে এ চিন্তা তাকে কর্‌তে হতো না। ফসল পোকায় নষ্ট কর্‌লে, সে কেবল নিজের ভাগ্যকেই নিন্দা করে থেমে গেল—তার প্রতিকারের জন্য কোন ঔষধ কী কিছু ব্যবহার কর্‌লে না। কিন্তু যদি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরীক্ষা করে জান্‌তে পার্‌তো যে এ সব পোকা কিসে যাবে, তা হলে তার ফসল নষ্ট হত না। এ সম্পর্কে একটু অবান্তর হলেও একটা কথা উল্লেখ-যোগ্য। রাঁচির কাছে 'বুণ্ডু' নামে একটা জায়গায় সরকার

বিহারের গালার দোষ-গুণ বিচারের জন্য একটা ল্যাবরেটরী করেছেন। সেখানে দেখা হয়েছে যে কতোরকম পোকায় গালার পোকা নষ্ট করে। আবার চেষ্টা করে গালাপোকার শত্রু যে পোকা, তার আবার শত্রু একটা পোকার চাষ করা হচ্ছে। অনুবীক্ষণ দিয়ে তারা দিনের পর দিন কেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে আর গালাপোকার শত্রু নাশ করছে। এসব দেখলেও মনে এমন একটা বিশ্বাস আসে যে এ চাষ কখন বিফল হবে না। আর সেই বিশ্বাসটার দাম কম নয়। বাংলাতেও ঢাকা ইত্যাদি স্থানে এসব জিনিষ কিছু কিছু হয়েছে বটে, কিন্তু যতটা দরকার তার তুলনায় এখনও কিছুই হয়নি। বাংলার চাষ সম্পর্কে বিশেষতঃ ধান সম্পর্কে এরকম ধরণের গবেষণা হওয়া উচিত। বাংলার চাষী এখনও দৈব সাহায্য ব্যতিরেকে চল্‌তে পারেনা। আর সেইজন্যই দৈব যখন বিমুখ হন, তখন চাষীর সর্ব্বনাশ হয় আর দেনার পরিমাণ বেড়ে যায়।

অনেকে বলেন (যেমন সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়) যে জমিদারের খাজনা না দিতে পারাই তার দেনার একটা প্রধান কারণ। অবশ্য এ সম্বন্ধে অনেক তর্ক-বিতর্ক হতে পারে, তবে এটা অনেক সময়ই বল্‌তে পারা যায় যে সব জায়গাতেই জমিদারের খাজনাই চাষীর ধারের কারণ নয়। এ সম্বন্ধে কয়েকটা হিসাবের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জেলা	গড়পড়্তা একর প্রতি খাজনা	সাধারণ সময়ে প্রতি একরের উৎপন্ন শস্যের দাম
বাঁকুড়া	১৸৹	৪৭৲
মেদিনীপুর	৩৵৹	৪৮৲
যশোহর	২৷৶৹	৫৭৲
খুলনা	৩৷৵৹	৬০৲
ফরিদপুর	২৷৷/৹	৫০৲
বাখরগঞ্জ	৪৷৷/৹	৭০৲
ঢাকা	২৸/৹	৬০৲
ময়মনসিংহ	২৸৹	৬০৲
রাজসাহী	৩৷/৹	৫৬৲
ত্রিপুরা	৩৵৹	৬০৲
নোয়াখালী	৪৷৹	৭৫৲ *

এই হতে বোঝা যাবে যে আয়ের তুলনায় যে খাজনা খুব বেশী তা বলে মনে হয় না। কারণ তার অন্যান্য খরচের বহর এর তুলনায় অনেক বেশী। আর তা ছাড়া অন্যান্য প্রদেশের কথা আলোচনা কর্‌লে দেখতে পাওয়া যায় যে তাদের খাজনা অনেক বেশী। যুক্তপ্রদেশে যথা—

* পৌষ, ১৩৪০, "ভারতবর্ষ", 'বাংলার জমিদারবর্গ ও প্রফুল্লচন্দ্র' শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

বিভাগ	গড়পড়তা প্রতি একরের খাজনা		প্রতি একরের উৎপন্ন শস্যের দাম
মিরাট—	ষ্ট্যাটুটারি	১৩৷৷৹	৭৫৲
	অকুপ্যান্সি	৬৲	
ঝাঁসি—	ষ্ট্যাটুটারি	৩৲	২৭৲
	অকুপ্যান্সি	২৷৷৹	
লক্ষ্ণৌ—	ষ্ট্যাটুটারী	৭৲	৬৩৲

কাজেই বাংলায় যে কৃষকের খাজনা বেশী তা বলে মনে হয় না। তার দেনার কারণ হচ্ছে অনুন্নত চাষ—চাষ বারে বারে খারাপ হওয়াতেই তার এ দুর্দ্দশা। কাজেই এর প্রধান কারণ আমরা বল্‌তে পারি যে চাষের আয়ের অস্থিরতা, খাজনা নয়।

দেনার আর একটা কারণ হচ্ছে পৈত্রিক দেনা। কতো যুগ হতে এই দেনা অল্পে অল্পে সঞ্চিত হয়ে বিরাট পরিমাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে সেটা বহন কর্‌তে হলে বিরাট শক্তির দরকার। কিন্তু সে শক্তি বাংলার চাষীর নেই—সেইজন্যে সে আজ দেনার ভারে নুয়ে পড়েছে। সরকারের নিযুক্ত এক কমিটী বলেছিলেন "ভারতের চাষী দেনার মাঝে জন্মগ্রহণ করে। দেনার মাঝে বাড়ে, আর দেনার মাঝেই মরে"। লাভের মধ্যে সে তার উত্তরাধিকারীর জন্যে পৈত্রিক দেনার পরিমাণ আরও কিছু বাড়িয়ে দিয়ে যায়। সেইজন্যে বাংলার চাষীর পক্ষে দেনার ভার

দূর করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে বলে মনে হয়। এই পৈত্রিক দেনাকেই চাষীর দেনার প্রধান কারণ বলে মনে হয়।

এই দেনার আরও কয়েকটা কারণ নির্দ্দেশ কর্‌তে পারা যায়, যেমন মহাজনের অত্যাচার প্রভৃতি। সত্যি সত্যি অনেক সময়ে মহাজনেরা অত্যাচার করেন। সরকার তদন্ত করে দেখেছেন যে কোন কোন জায়গায় শতকরা ৩০০৲ টাকা সুদ পর্য্যন্ত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এটা একটা অসাধারণ ব্যাপার হলেও শতকরা ২৫৲ টাকা হতে ৩৫৲ টাকা পর্য্যন্ত সুদ অনেক জায়গাতেই দেখা গিয়েছে। সুদের এই যে হার, এটা অত্যন্ত বেশী বলে মনে হয়। আর তা ছাড়া মহাজনদের বিরুদ্ধে আরও নানা রকম অভিযোগ আনা হয়—যে তাঁরা অনেক সময় অন্যায় করে চাষিদের ঠকিয়ে জমি জমা কেড়ে নেন। গল্পে প্রবন্ধে উপন্যাসে এর বিরুদ্ধে সমালোচনা প্রচুর পরিমাণে হয়েছে—সেই জন্য এখানে আর মহাজনদের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করতে চাই না। তাঁহাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো আনা হয়, তা হয়তো অধিকাংশই সত্য। কিন্তু তবু আমাদের একটা কথা ভুল্‌লে চল্‌বে না, যে বাংলার যখন উন্নতি হয়েছিল তখনও মহাজনেরা ছিল আর তাদের কারবারের ও কম্‌তি ছিল না। সেই জন্যে মহাজনদের উপস্থিতিই যে দেনার একমাত্র কারণ তা নয়—দেনার মূল কারণ হচ্ছে চাষীদের অবস্থা বিপর্য্যয়। অবস্থা ভাল থাক্‌লে চাষীরা চড়া হারে সুদ দিয়েই দেনা কাজে লাগিয়ে শস্যোৎপাদন করেছে,

কিন্তু এখন সেটা হয়ে উঠ্‌ছে না বলেই দেনা মারাত্মক হয়ে উঠছে।

চাষীদের দেনার আর একটা কারণ হচ্ছে তাদের অন্যায় মামলাপ্রিয়তা। চব্বিশপরগনার চাষীদের কথা শোনা যায় যে যদি চার পয়সা নিয়ে বাজারে যায়, তো অনেক সময় তিন পয়সার বাজার করে এক পয়সার ডেমিতে একটা কিছু দরখাস্ত করে। এতে নিজেরা সর্ব্বস্বান্ত তো হয়ই, অপর এক জনেরও অর্থনাশ হয়। দেশের অর্থ এরকম ভাবে নাশ করা চাষীদের উচিত কি?

চাষীদের কি দেনা আছে না আছে এ নিয়ে এতো চিন্তার কারণ কিছু ছিল না। কিছু চাষার দেনা বাড়ার এই ফল হচ্ছে যে চাষা সর্ব্বস্বান্ত হচ্ছে—তার জমি অন্য কারও হাতে গিয়ে পড়্‌ছে। যদি জমি থাকে তা হলেও সে দেনায় জর্জ্জরিত হয়ে চাষের জন্যে দরকার টাকাকড়ি না পেয়ে চাষ করে উঠতে পারছেনা। এই রকমে বাংলার বারো আনা লোক ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই জন্যই বাংলার কৃষিঋণ এতবড় সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং কৃষির জন্য দরকারী টাকা সরবরাহ করার কোন উপায় ভেবে বার করতে হবে। প্রথমতঃ কৃষি ঋণের কথা আলোচনা করলে দেখা যায় যে এটা এতবড় সমস্যা যে কেবল চাষীর পক্ষ হতে চেষ্টায় এর কিছু হবে না। সরকার পক্ষ এবং যাঁরা সরকার ও চাষীর মাঝামাঝি রয়েছেন—তাঁদেরও পক্ষ হতে চেষ্টা দরকার।

সরকার পক্ষ হতে কিছু কিছু চেষ্টা হয়েছে। যাতে মহাজনেরা বেশী সুদ না নেন, সেইজন্যে মহাজনদের আইন পাশ হয়েছে। এতে স্থির হয়েছে যে শতকরা ১০৲ টাকার বেশী সুদ কেউ নিতে পারবে না, আর সুদ যদি আসলের বেশী হয়ে উঠে তবে আসলের সমান সুদ পাওয়া যাবে, তার বেশী আর পাওয়া যাবে না। এই আইন হয়ে বাংলার মহাজনদের অন্যায় সুদ নেওয়ার আশঙ্কা কমেছে। এ ছাড়া আরও একটা আইন হবার প্রস্তাব চল্‌ছে। যেখানে দেনা বেশী হয়ে গিয়েছে, সে সব দেনা যাতে কোন রকমে মিটে যায়। মোটামুটী ঠিক হয়েছে যে, যে দেনা পুরাপুরী এক বছরের মধ্যে দিতে হ'তো সে দেনার শতকরা হয়ত মোটে ৬০৲ টাকা দিতে হবে, এবং তাও এক বছরে নয়, কয়েক বছরে। অবশ্য প্রত্যেক চাষীর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে, কিন্তু মোটামুটী এরকম স্থির হয়েছে। এই দুটীতে আশা করা যায় যে চাষীর ধার আর বেড়ে চলবে না— অন্ততঃ কিছু পরিমাণ কম্‌বে। এ ছাড়াও আমাদের বর্ত্তমান লাট-সাহেব বলেছিলেন যে দেউলিয়ার নূতন রকম আইন তৈরী হওয়ার দরকার, কারণ বর্ত্তমান আইন এত ব্যয়সাধ্য যে অনেক সময় চাষারা তার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে না, আর সেইজন্য সর্ব্বস্ব হীন হয়েও ধারের উপরে ধার করে তার চল্‌তি দাবী মেটায়। কিন্তু যদি একটা অল্পব্যয়-সাধ্য দেউলিয়া আইন হয়, তবে চাষীরা সহজেই তার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। অবশ্য

কথাটা প্রথমে শুন্‌তে কি রকম কি রকম বোধ হলেও, এর মধ্যে ভেবে দেখবার জিনিষ আছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হওয়ার আগে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কিং এন্‌কোয়ারী কমিটী বলেছিলেন যে ভারতবর্ষে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হবে তাতে কৃষির অর্থ সরবরাহের একটা ব্যবস্থা থাকা উচিত। কিন্তু চাষীর দুর্ভাগ্যবশতঃ সে পরামর্শ গ্রাহ্য হয় নি। উপস্থিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে কৃষি ঋণের ব্যবস্থার বদলে কৃষির অর্থ সরবরাহ সম্বন্ধে সকল ব্যাপারের খোঁজ রাখবার জন্য কয়েকজন লোক থাকবেন মাত্র। সকল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য কৃষির অর্থ সরবরাহকারী ব্যাঙ্কের কাজে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যাতে সাহায্য কর্‌তে পারে সেদিকে এঁরা লক্ষ্য রাখবেন।

এইত গেল সরকার পক্ষের চেষ্টার নমুনা। কিন্তু একবার সমস্ত দেনা ছেঁটেছুঁটে পরিষ্কার করে দিলেও সে অবস্থা কিছুতেই থাকতে পারে না, যতক্ষণ না চাষীর সেই অবস্থা বজায় রাখতে সমর্থ না হয়। সংস্কৃতে একটা শ্লোক আছে যে হাতীকে স্নান করিয়ে দিলেও সে পরিষ্কার থাক্‌তে চায় না সে ধুলো মাখে। কিন্তু তার যদি কিছুমাত্র পরিচ্ছন্নতা জ্ঞান থাকে তবেই তাকে পরিষ্কার রাখা সম্ভব হয়। তেমনি চাষীদের অঋণী রাখতে হলে তাদের ঋণ ছাড়া চলবার উপায়ে শিখিয়ে দিতে হবে। ছোট ছোট আরও সাহায্যের দরকার হলেও প্রধানতঃ সে উপায় হচ্ছে সমবায়, আর সে জন্যে লেখাপড়া

কিছু কিছু জানবার দরকার। এই জন্যেই সরকারের নিযুক্ত এক কমিশন বলেছিলেন যে সমবায় আর শিক্ষাতেই কৃষিঋণ ঘুচবে। *

কৃষি ঋণ ঘোচাবার প্রধান উপায় স্বরূপ আর চাষের অর্থ সংগ্রহেরও প্রধান উপায় স্বরূপ সমবায়ের কথা এবং আরো অন্যান্য কি দু একটা উপায় আছে সেই কথা আলোচনা করেই আমরা এ অধ্যায় শেষ করব। সমবায় জগতে একটা অদ্ভুত জিনিষ। সত্যি কথা বলতে কি, ছোট ছোট হতে আরম্ভ করে বড় বড় কাজে পর্য্যন্ত সমবায় যে রকম সফল হয়েছে যে তা আর বলবার নয়। চাষীর ঋণ দূর করার জন্যে নানা রকম সমবায়ের মধ্যে ইংরেজিতে যাকে credit co-operation বলে অর্থাৎ ঋণ সমবায় সেইটেরই বহুল প্রসারের দরকার। অবশ্য, সঙ্গে সঙ্গে অ-ঋণ সমিতির স্থাপনার ব্যবস্থাও করতে হবে, কারণ ঋণ লাঘব ও আয় বৃদ্ধি একই জিনিষের এপিঠ ওপিঠ।

সমবায়ের মূল কথাটা হচ্ছে যে কয়েকজন মিলে একটা সমিতি স্থাপনা করবেন। তার মধ্যে গ্রামের সমবায় একটু অন্য ধরণের। গ্রামে সমবায় করতে হলে সভ্যেরা মিলে একটা অপেক্ষাকৃত ছোট সমিতি স্থাপনা করবেন কারণ খুব বেশী জায়গা নিয়ে সভ্য হলে গ্রামে অসুবিধে হয়ে পড়ে। ধরুন সাধারণ একটা গ্রামের সমস্ত লোক মিলে চাঁদা দিলেন

* Royal Commission on Agriculture.

সেই সমিতিতে। সেই সমিতিতে কেউ লাভ চাইবেন না—কারণ তা'হ'লে সমিতি দাঁড়িয়ে উঠবে না। এ যেন নিজেরই জিনিষ, আমার গ্রামের ভাইদের দুঃসময়ে সাহায্য করার জন্যে এর সৃষ্টি—এই ভাবই হচ্ছে সমবায়ের মূল কথা। বস্তুতঃ এই সমবায়ের প্রথম উদ্ভাবণ কর্ত্তা রাইফাইসেন সাহেব এই জন্যই পল্লীর জন্য সহর হতে আলাদা সমবায় করতে বাধ্য হয়েছিলেন,—তারপরে যখন কোন সভ্যের দরকার হবে তখন সেই সমিতি তাঁকে সাহায্য করবে—তাঁকে মহাজনের দ্বারস্থ হতে হবে না। পল্লী ঋণ দান সমবায় সমিতির মুল কথা এই।

সমবায় বা কো-অপারেশন এখন বাংলা দেশে কম প্রসার লাভ করছে না। দেখা যায় যে বাংলায় এখন ২২৪৬৯টী সমবায় সমিতি আছে অর্থাৎ প্রতি ১০০০০ লোকের মাঝে ৪৮টী করে' সমিতি রয়েছে। তাদের সভ্যসংখ্যা হচ্ছে ৭০৭৭৪৯। তাদের মোট টাকার পরিমাণ ১৪৬০১০০০০৲ টাকা। এই হতেই দেখা যায় যে বাংলায় সমবায় বেশ প্রসার লাভ করে চলেছে—আর সমবায়ের কথা আমাদের অনেকটা পরিচিত হয়ে গিয়েছে বলেই সে সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা হল না।

এই সমবায়ের সুবিধা অনেক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে "সমবায় ঋণদান সমিতি তো গ্রামবাসীকে মহাজনের হাত হইতে উদ্ধার করিতে পারে।" যদি টাকার দরকারে গ্রামের লোকেরা

নিজেদের সমিতি হতে কম সুদে টাকা পায়, তবে মহাজনের হাতে তার বিনাশের সম্ভাবনা নেই। আর সব লোক সমিতির কাছে অল্প সুদে টাকা পাওয়ায় যেখানে সমিতি হয় সেখানে মহাজনদের সুদের হারও কমে আসতে বাধ্য। এ সম্বন্ধে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখেছেন "যে সকল জায়গায় এক সময়ে মহাজনের সুদের শতকরা ৩০৲, ৪০৲, ৫০৲ এমন কি সময়ে সময়ে ১৫০৲ ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ছিল, এখন সে সব জায়গায় সমবায় সমিতির প্রতিযোগিতার ফলে তা ১৫৲, ২০৲ টাকায় নেমেছে।"

এই সমবায়ে মহাজনদের অত্যাচার কমেছে, কিন্তু এই সমবায়ের আশ্রয় নিয়েই আর এক অত্যাচার এসে চাষীদের উপরে দেখা দিচ্ছে, সে সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত।

সরকার বাহাদুরের কিছু দিন পূর্ব্বে খেয়াল হয়েছিল যে ভারতবর্ষে অনেক সমবায় সমিতি স্থাপনা করতে হবে, কারণ সমবায় হচ্ছে সভ্যতার একটা চিহ্ন। এই রকম মনোভাবের জন্যেই হোক্ আর যে কারণেই হোক্ সমবায় ঋণদান সমিতি যথেষ্ট বেড়ে গেল, আর সেই সমবায় সমিতিগুলিও বুঝে না বুঝে চাষীকে বহু টাকা দেনা দিয়ে দিল। কিন্তু না বুঝে দেওয়ার জন্য সে টাকা তাদের আদায় করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়্ল। সেইজন্যে সে ঋণ দান সমিতিদের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। সরকার তখন তাঁদের সাধের সমবায়ের এই অবস্থা দেখে, সে

সমিতিগুলিকে খাড়া রাখবার এক উপায় বার্ করেছেন। তাঁরা আরও কতকগুলি অল্প মেয়াদের ব্যাঙ্ক স্থাপনা করছেন—তার নাম হল জমি বন্ধক ব্যাঙ্ক (Land-mortgage Bank)। সেই ব্যাঙ্ক-গুলির উদ্দেশ্য হ'ল চাষার জমি বন্ধক রেখে ঋণ দেওয়া। কিন্তু সে ঋণ চাষার ব্যবহারে নাও যেতে পারে। জমি বন্ধক নিয়েই সে ব্যাঙ্ক ঋণের টাকা চাষাকে না দিয়ে চাষার পাওনাদার সমবায় সমিতিকে শোধ দিতে পারে।

এতে এমন কতকগুলি অসুবিধা হয়েছে যে যাতে চাষীর অত্যন্ত অসুবিধা হতে পারে। প্রথমতঃ চাষী যখন সমিতি হতে ধার করেছিল, তখন সে তার জমির মালিক ছিল। সে জমিতে চাষ করে হোক্ বা যে উপায়ে হোক্ হয়তো কিছু কিছু শোধ দিতে পারতো। এইসব কারণে জমী বন্ধকী ব্যাঙ্ক বাংলায় প্রসার লাভ করছে না।

কেউ বল্‌বেন যে সমিতিতে কেন, অন্য জায়গায় ধার করলেও তো তাকে জমি বন্ধক রেখে বা জমি বেচে ধার শোধ করতে হ'ত। কথাটা সত্যি,—কিন্তু জমি বন্ধক ব্যাঙ্কের আর একটু আলোচনা কর্‌লে দেখা যাবে যে জমি বন্ধক হওয়ার পর চাষার কি দুর্দ্দশা হয়। প্রথমতঃ সে কোন রকমে সমিতির ঋণ পরিশোধ করলে। কিন্তু জমিবন্ধক ব্যাঙ্ক তাকে যা ঋণ দিয়েছিলেন, সে ঋণ তাঁরা আদায় করেন অত্যন্ত কড়াকড়ির সঙ্গে যাতে তাঁদের টাকা নষ্ট না হয়ে যায়। মাত্র কুড়ি বছর

মেয়াদে এঁরা মোটা টাকা ধার দিচ্ছেন—আর আদায়ের বেলাও টাকার অঙ্ক সেই রকম মোটা হয়ে উঠছে। চাষীকে যে রকমে হোক টাকা দিতে হবেই। সে ঘটি-বাটী বেচেই হোক্ বা অন্য উপায়েই হোক। আর যদি তার কোন উপায়ে টাকার সংস্থান না হয় তবে জমিবন্ধক ব্যাঙ্কের কাছে জমি ছেড়ে দিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পথে বসতে হবে। এ যে মহাজনের চেয়ে কম অত্যাচার কোথায় তা বুঝি না। সেইজন্যেই বুদ্ধিমান চাষীরা কখনও এই অল্প মেয়াদের জমিবন্ধক ব্যাঙ্কের কাছে যেতে রাজী নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে ময়মনসিংহ কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে জমিবন্ধক ব্যাঙ্ক রয়েছে বটে কিন্তু চাষীরা সেখানে না গিয়ে চাই কি মহাজনের কাছে যায়। যাঁর ইচ্ছা এ'কথা অনুসন্ধান করে দেখতে পারেন।

যে বন্যশিশু, তাকে যদি বলা হয় যে জামা পরো কারণ সেটা সভ্যতার লক্ষণ, তা হলে সেটা তার বোঝা হয়ে ওঠে। কিন্তু যদি সত্যি সত্যি তার মনে সভ্যতা বোধ জাগরিত হয়ে ওঠে, তখন জামাটা তার বোঝা নয়। তেমনি উপর হতে চাপানো এই সমবায় আমাদের চাষীর উপরে বোঝা হয়ে রয়েছে। আর সমবায়ের মূলমন্ত্র যে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা সেইটেই এতে না থাকায় ক্রমশঃ ক্রমশঃ এর ভেতরের অত্যাচারী রূপটা প্রকাশ পাচ্ছে। কাজেই উপর হতে চাপান সমবায় চাষীর উপকারী হবে বলে বোধ হয় না ; এবং তার যে অনুচর

অল্প মেয়াদের জমিবন্ধক ব্যাঙ্ক—তার উপকারের চেয়ে অত্যাচারটাই এতো প্রবল হয়ে পড়ে যে চাষীদের কাছে এটা একটা ভীতির কারণ হয়ে পড়ে। চাষীরাও সেটা বুঝতে পেরে একে পরিহারের চেষ্টাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

সেইজন্য বল্‌তে পারা যায় যে চাষীরা এই সব সরকারী ছাপ মারা মহাজনের সাহায্য না নিয়ে তাদের অন্তর হ'তে সমবায় করুক্। স্যার হোরেস প্লাঙ্কেট বলেছিলেন যে এখনো সমবায় যে ভেঙে যাচ্ছে তার কারণ এই যে তারা প্রকৃত সমবায় নয়, তারা সরকারী নীতির ফল মাত্র। কিন্তু সমবায় হতে যদি প্রকৃত উপকার আশা করতে হয় তবে কেবল এ সমবায় হলে চল্‌বে না—চাষীদের নিজেদের হৃদয়ে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা উপলব্ধি করে তাদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা দিয়ে সমবায় গড়ে তুল্‌তে হবে। তাদের অর্থের অভাব হবে না। তিল তিল করে তাদের পাত্র অক্ষয় হবে।

যেখানে নিতান্ত অর্থাভাব রয়েছে সেখানে চাষীরা গ্রামের জমিদার বা দেশ-হিতকারী অথচ সমৃদ্ধ কোন কোন ব্যক্তিকে নিতে পারে এবং তাঁদের উৎসাহে ও সাহায্যে তাদের সমবায় সমিতি নিখুঁত হয়ে গড়ে উঠবে। সমবায়ের নীতিতে এটা হয়তো কিছু বাধ্‌তে পারে। কিন্তু প্রত্যেক স্থানেই অবস্থা বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। আর তা ছাড়া এতে যে সাম্যনীতিতে আঘাত পড়বে তা বলে মনে হয়

না। মতিলাল নেহেরু অগাধ ধনী হলেও তিনি চাষাদের একজন নেতা ছিলেন। কাজেই চাষীদের মাঝে একজন সমৃদ্ধিশালী লোক এলেই সাম্য ভেঙে যাবে এমন নয়।

সেইজন্যে কৃষিঋণ দূর করতে হলে আর কৃষির অর্থ যোগাতে হলে সমবায়ের—প্রকৃত সমবায়ের একান্ত দরকার। চাষীদের এখন একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত সমবায়। এই সমবায়ের নানাদিক সম্বন্ধে পরের অধ্যায়ে আলোচনা করে দেখা যাবে কি করে সমবায় চাষীর সমস্ত দিকের দুঃখ অভাব মোচন করতে পারে।

অবশ্য এর জন্য কিছু শিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু সমবায় যখন ক্রমশঃ আমাদের ঘরের জিনিষ হয়ে দাঁড়াবে তখন এটা বুঝতে বেশী কিছু বিদ্যার দরকার হবে না। এখানে মার্কস বুঝতে অর্থনীতির এম্ এর দরকার। কিন্তু রাশিয়ায় মার্কসের মূল কথাটা চাষীতেও বোঝে। বিদ্যার প্রয়োজন যে নেই তা নয়। তবে যেখানে মূলমন্ত্র হৃদয়ঙ্গম হয়ে গিয়াছে সেখানে বিদ্যার প্রয়োজন প্রাথমিক নয়।

চতুর্থ অধ্যায়

সমবায়।

যে দেশের গরীব ধনী হইবার ভরসা রাখে, সে দেশে সেই ভরসাই মস্ত ধন। রবীন্দ্রনাথ

পূর্ব্ব অধ্যায়ে কেবল ঋণ দান সমবায় সমিতি সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ঋণ দান সমবায় সমিতিই যদিও ভারতবর্ষে সব চেয়ে বেশী প্রসার লাভ করেছে, তবুও সমবায় কেবল ঋণ দানের মধ্যেই আবদ্ধ নয়,—তার রূপ অনন্ত। মনের মাঝে যখন সমবায়ের মূল মন্ত্রটা অভ্যস্ত হয়ে আসে তখন প্রত্যেক বিষয়েই সমবায় গড়ে ওঠে। সমবায় মানে আর কিছুই না, কেবল মিলিত হওয়া। তাই যখনই কোন সামান্য দরকার হয় তখনই কয়েক জন মিলিত হয়ে কাজ কর্‌লেই সেটা সমবায়। সমবায় একটা আশ্চর্য্যকর কিছু নয়।

এই সমবায়ের বলে সকল দেশেই অসাধ্য সাধন হতে পারে। যা হয়তো কোন কালে চাষীদের কল্পনাতেও ছিল না, সেটা সমবায়-বলে তাদের হাতের মুঠোর এসে পড়তে পারে। বিদেশ এবং স্বদেশ হতে এর দুটো একটা উদাহরণ দিলেই এটা সুস্পষ্ট হবে।

আয়র্লণ্ডের ডোনিগাল প্রদেশে ডান্‌গ্লোতে মহাজনদের অত্যাচার অত্যন্ত বেশী ছিল। বোধহয় জগতে ডোনিগাল প্রদেশের এই মহাজনদের মতো এতো অত্যাচার কোথায়ও হয় নি। এদের নগদ কারবার ছিল না। খুব চড়া হারের স্থদে এদের ধারে কারবার চল্‌ত। শেষে অবস্থা অত্যন্ত ভীষণ হয়ে দাঁড়াল। ধারে প্রত্যেক চাষীর বাড়ী বিক্রি হয়ে গেল, জমি নীলাম হয়ে গেল। কিন্তু নীরবে সহ্য করা ছাড়া চাষীদের আর কোন উপায় নেই। কেবল মাত্র বাড়ীর মেয়েদের সূচী-শিল্পের দ্বারা যে সামান্য আয় হত, সেই ছিল ডোনিগাল প্রদেশের চাষার একমাত্র আয়। এসময় প্যাট্রিক গ্যালাঘের বলে একজন নেতার অবির্ভাব হ'ল। প্রায় বছর ত্রিশের কথা, তিনি তাঁর কয়েকটা বন্ধুকে নিয়ে মহাজনদের বিরুদ্ধে একটা সমবায় সমিতি স্থাপিত কর্‌লেন, সেই সমিতির নাম হল টেম্‌পল-ক্রোন সমবায় সমিতি।

৬৮ মাইল দূর হতে চা, ময়দা প্রভৃতি জিনিষ নিয়ে এসে সেই সমিতির একটা দোকান খোলা হল। ক্রমশঃ ক্রমশঃ তার শ্রীবৃদ্ধি হল। মহাজনেরা নানা প্রকার বাধা দেওয়া সত্ত্বেও গ্যালাঘের ঠেলে উঠলেন আর মহাজনদের দোকান পত্র ক্রমশঃ ভেঙ্গে গেল। এখন সেখানে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে যে মহাজনদের চিহ্ন মাত্র নেই—তার বদলে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর তার দৌলতে সমস্ত দেশখানি হাস্‌ছে।

বছর ত্রিশ আগে যেটা স্বপ্নের অতীত ছিল, এখন কি অপূর্ব্ব মন্ত্রবলে সেটা সম্ভব হয়ে পড়েছে।

এই হতেই বোঝা যায় যে কি সুন্দর উপায়ে ছোট ছোট সমবায় সমিতি বড় বড় শক্তিশালী সমিতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারে। যে দেশেরই সমবায় সমিতির কথা পড়িনা কেন, সেই দেশেই দেখি যে সমবায় সমিতিই বড় বড় কল কারখানাকে এক চেটিয়া অত্যাচার করতে না দিয়ে তাকে কায়দায় রেখে দিয়েছে—তার আর অত্যাচার করার ক্ষমতা নেই। এই জন্য ভারতবর্ষেও সমবায়ের খুব বেশী প্রচার বাঞ্ছনীয়।

ভারতবর্ষে সমবায়ের ইতিহাস খুব বেশী দিনের নয়। সর্ব্ব-প্রথম ১৯০৪ সালে কেবল মাত্র ঋণদান সমবায় সমিতি অনুমোদন করে একটা আইন পাস হয়েছিল। ঋণদান সমবায়ই সব চেয়ে সহজ বলে কেবল মাত্র এইটেরই অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তাতে ঠিক হয়েছিল যে অন্ততঃ দশ জন যদি পরস্পরের দায়িত্ব স্বীকার করে একত্র ঋণদান করে, তাহলেই সেটা ঋণদান সমবায় বলে গ্রাহ্য হবে। (ঋণদান সমিতি হলেও এদের শতকরা দশটাকা শিক্ষা এবং অন্যান্য দাতব্যে খরচ করতে অনুমতি দেওয়া হল।) ফলে সে সময় শীঘ্র অনেকগুলি ঋণদান সমবায়ের স্থাপনা হল।

কিন্তু দেশে নানা প্রকার অভাব থাকায় কেবল ঋণদান সমবায়ে বেশী দিন গেলনা। ১৯১২ সালে আবার একটা আইন

পাস করে অ-ঋণদান সমবায় সমিতির ব্যবস্থা করা হল। এদেরও শতকরা ১০৲ টাকা শিক্ষা এবং অন্যান্য দাতব্যে খরচ করতে অনুমতি দেওয়া হল। এই আইনের পর হতে ভারতে সমবায় বহু বিস্তৃত হয়ে পড়্ল।

এর কিছু দিন বাদে নানা প্রকারের সমিতি দেখা দিল। ভারতবাসী সমবায়ের পক্ষপাতী হয়ে পড়্ল। সেই জন্য কেবল ঋণদানের জন্য নয়—জীবনের সবরকম অভাব মেটাবার জন্যেই সমবায়ের দরকার এটা ভারতবাসী বুঝতে পেয়েছিল। বাংলা দেশে সমবায় সমিতির খানিকটা প্রসার হলেও সমবায়ের এখনও যথেষ্ট প্রসার লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। সর্ব্ব প্রথমেই দেখা যায় যে জিনিষ বিক্রি করার জন্য চাষীদের কোন সমবায় সমিতি নেই। গ্রামে গ্রামে প্রত্যেক চাষী আপনার আপনার মত চাষ করে ; তারপর যখন তার ফসল হয়, তখন সাধারণতঃ সে ফসল যে কোন আড়তদারের কাছে বিক্রি করে দেয় আড়তদারের হাতে পয়সা আছে, ক্ষমতাও অসীম—সে ইচ্ছে হলে ফসল কিন্‌তেও পারে না কিন্‌তেও পারে। কিন্তু চাষীদের তার কাছে ফসল না বিক্রি করে উপায় নেই,—হয়তো সেই দিন ফসল বিক্রি করে পয়সা নিয়ে গেলে তার বাড়ীর রান্না বান্না হবে। কাজেই তাকে যে রকমেই হোক্ ফসল বিক্রি কর্‌তেই হবে। আর তার গরজ বুঝে আড়তদারও খুব সস্তা দামে তার কাছ হতে সমস্ত ফসল কিনে নেয়। তার পরে যখন দাম বাড়ে, তখন

সে ফসল বিক্রি আরম্ভ করে আর প্রচুর লাভ করে। কিন্তু যারা সারা বছর প্রাণপণ খেটে গায়ের রক্ত জল করে ফসল উৎপন্ন করেছে তারা সে লাভের অংশ পাওয়া দূরে থাক নিজেদের পরিশ্রমের ন্যায্য মূল্যও না পেয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু লাভ কার হওয়া উচিত? যে দৈহিক পরিশ্রমে ফসল উৎপন্ন করেছে, তার—না যে কেবল অর্থবলে আর সবাইকে দাবিয়ে রাখতে পেরেছে বিনা পরিশ্রমে—তার?

কিন্তু চাষীদের যদি একটা সমবায় সমিতি থাকে তা হলে সেই সমবায় সমিতিই ন্যায্য দাম দিয়ে চাষীদের সমস্ত ফসল কিনে নিয়ে ন্যায্য দামে সেটা বিক্রি করতে পারে। সমবায়ে লাভের প্রচেষ্টা নেই,—সেইজন্য আড়তদার বা ব্যবসাদারের যে লাভ সে লাভটা সমবায়ে চাষীদের হাতেই যাবে। এ হলে পরে যেটা চাষীদের ন্যায্য পাওনা, সেটা হতে তারা আর বঞ্চিত হবে না। উপরে আয়র্লণ্ডের যা উদাহরণ দিয়েছি, তা হতেই এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উৎসাহী লোক থাকলে এই রকম সমবায় সমিতি বড় বড় ব্যবসায়কে সহজে কায়দায় রাখতে পারে।

বাংলায় এই ধরণের সমবায়ের প্রচুর প্রসার হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের চাষীরা যা কিছু সামান্য উৎপাদন করে তার দাম তারা পায় না। কিন্তু যদি বিক্রয় সমবায় সমিতির সাহায্যে তারা তাদের জিনিষ উপযুক্ত দামে বিক্রি করাতে

পারে তবে চক্ষের পলকে তাদের অবস্থা বহু পরিমাণে উন্নত হবে—এতে কোন সন্দেহই নাই।

বাংলার প্রত্যেক শস্য বিক্রয়ের জন্য এরকম সমিতি চাই। ধানের আর অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের সমিতি হওয়া প্রয়োজন। আরও দরকার হচ্ছে বাংলায় আখের চাষ ও পাট চাষের জন্য এই রকম সমিতি। চিনির দর এবং পাটের দর বাজার বুঝে বড়ই ওঠা নামা করে। এ অবস্থায় যদি বাজারের চাহিদা অনুসারে জিনিষের সরবরাহের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করতে পারা যায় তাহলে—দামটা মোটামুটী ঠিক থাক্‌বে, আর তাহলে চাষীরা তার উপকার পাবে। আর দাম যদি ঠিক থাকে, তাহলে যে কেবল চাষীদের উপকার হবে তা নয়। এই পাটের দামের উপরে বহু মিলের নির্ভর, বহু ব্যবসায়ীর নির্ভর, এমন কি জাহাজ কোম্পানীর পর্য্যন্ত নির্ভর। কাজেই পাটের দর বা চিনির দর বেশী উঠা-নামা না করে যদি মোটামুটি সমান থাকে তবে বহু লোকেরই লোকসানের সম্ভাবনা থাকবে না। সমবায় একসঙ্গে সমস্ত পাট বা চিনি নিয়ে পরে বাজারের চাহিদা বুঝে জিনিষ সরবরাহ করে, দাম ঠিক রাখতে পারবে। কিন্তু যতক্ষণ এটা সমবায়ের হাতে না পড়বে, ততক্ষণ দাম সমান থাকা সম্ভব নয়। কারণ দাম ঠিক রেখে চাষীদের অবস্থা ভাল রাখা আড়তদারের উদ্দেশ্য নয়—নিজেদের সবচেয়ে বেশী লাভই তাদের উদ্দেশ্য। এইজন্য চাষীর অবস্থা ভাল করতে হলে ও রকম সমবায় একান্ত প্রয়োজনীয়।

এই হ'ল বাজারে বিক্রি করার সময়ের কথা। কিন্তু শস্য উৎপাদনের সময়েও সমবায়ের দরকার রয়েছে। অনেক সময় হয়তো চাষীদের জমিতে কূয়া বা পুকুরের অভাবে জলসেচ বন্ধ থাকে। কিন্তু একজন দু'জন চাষার এমন সঙ্গতি নেই যে তারা কূয়ো খোঁড়ে বা পুকুর কাটে। এ অবস্থায় যদি সমবায় সমিতি হতে পুকুর কেটে দিয়ে বা কূয়ো খুঁড়ে দিয়ে পরে ধীরে ধীরে চাষীদের কাছ হতে তার খরচাটা আদায় করা হয় তাহলে সব দিক্‌কার অসুবিধা মেটে। চাষীদের জমিতে জল সেচ হওয়ার পর হতে তাদের ফসল ভাল হবে। আর তার ঋণ শোধ করতেও কোন কষ্ট হবে না।

আখের চাষে আমরা দেখতে পাই যে সময়ে সময়ে এক একটা কল বেরোয় যাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল হতে বেশী রস বের করার ক্ষমতা আছে। এখন সে সময় চাষাদের উচিত হচ্ছে যে পুরাণ কল ছেড়ে দিয়ে নূতন কল ব্যবহার করা। তাতে তাদের লাভের সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু কোন একজন চাষায় হয়তো সে কল কিন্‌তে পারে না। এ অবস্থায় কোন সমবায় সমিতি থাকলে সেই সমিতি হতে কলটা কেনা হয় আর তার ব্যবহারের একটা ভাড়া ধার্য্য করা হয়, সেই ভাড়াতে কলের দামও উঠে যাবে আর চাষীরাও কিছু কিছু লাভবান হবে।

আবার হয়তো কোন একটা বড় মাঠ জলা হয়ে পড়ে

আছে। মাটী হতে জল উঠে উঠে তার চাষ আবাদ বন্ধ করে দিয়েছে। সে অবস্থায় কোন সমবায় সমিতি সেই জমির নীচে ড্রেন পাইপ বসিয়ে জল নিকাশ করে জল বার করে দিলে পর সে জমিটা চাষের যোগ্য হয়ে উঠ্‌বে। তারপর সে জমি যে সব চাষারা বন্দোবস্ত নেবে, সেই সব খাজনা হতে সে জমির জল নিকাশের খরচ উঠে আস্‌বে, আর মাঝ হতে চাষীদের কিছু কিছু জমি বেশী হওয়ায় তারা কিছু লাভবান্‌ হবে। অবশ্য এ ব্যবস্থা হচ্ছে যেখানে চাষীদের কোন সমবায় সঙ্ঘ নাই। আর যেখানে চাষীদের নিজেদের সঙ্ঘ রয়েছে সেখানে তো তারা নিজেরাই সে জমি চাষ করে লাভ করবে।

আরও নানা বিষয়ে সমবায় হতে পারে। এসবের মধ্যে ভারতবর্ষে যা সবচেয়ে বেশী গড়ে উঠেছে সে হচ্ছে গো-পালন সমবায়। অনেক জায়গাতেই দেখা যায় যে গ্রামে গরু রাখা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হয়ে পড়ে। সেইজন্য সামান্য কয়েক জন ছাড়া গরু রাখা সকলের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। আর গোয়ালাদের অর্থাভাবে গরু ঠিক রাখা না হওয়ায় খাঁটি দুধ বা স্বাস্থ্যকর দুধ পাওয়া শক্ত হয়ে ওঠে। সাধারণতঃ গরুগুলি রুগ্ন হয়ে পড়ায় তাদের দুধও অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়ে। এই জন্য পাড়াগাঁয়ে পর্য্যন্ত দুধের সমস্যা একটা বড়ো কম সমস্যা নয়।

সমবায়ের সাহায্যে অনেক জায়গায় এই সমস্যার খানিকটা

সমাধান হয়েছে। কেমন করে অতি সাধারণ ভাবেই বেশী কিছু হৈচৈ না করে কয়েকজন গোয়ালা একটা সমবায়ের সাহায্যে ভাল দুধ সরবরাহ করতে পেরেছিল—তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

কাশীধামের কাছে কয়েকজন গোয়ালা মিলে একটা সমবায় গোপালন সমিতি স্থাপনা করলে আর সেই সঙ্গে তারা একটা সমবায় ঋণদান সমিতির স্থাপনা কর্‌লে। সেই অর্থবলে এবং কাশীর মূল সমবায় সমিতিও একটা জমিদারের সাহায্যে তারা কাশী সহরের নানাস্থানে দোকান খুললে। সভ্যরা সব নিজেদের সমস্ত গরুর দুধ সমিতির কাছে একটা বাঁধাদরে বিক্রি করে দিত। আবার সমিতিটা বাঁধাদরে নগদে সেই দুধ বিক্রি কর্‌ত। এতে ক্রমশঃ ক্রমশঃ তাদের যথেষ্ট লাভ হতে আরম্ভ হ'ল এবং সহরেও একটা খাঁটি দুধ পাওয়ার উপায় হ'ল।

বাংলাতেও এরকম সমিতি অনায়াসে হতে পারে। এবং কয়েকটি এরকম ভাল সমিতি আছেও। যেখানে কয়েকজন গোয়ালা আছে, সেইখানেই এরকম একটা সমবায় সমিতি স্থাপিত হতে পারে। এতে আরও একটা লাভ এই যে সমবায়ের সভ্য কোন গোয়ালা তার দুধের খাঁটিত্ব নষ্ট কর্‌তে সাহস পাবে না। কারণ তাতে তার সমবায়ের সুনাম নষ্ট হবে,—আর সে জানে যে সমবায়ের দুধ বিক্রি না হলে, তার বহু অসুবিধা হবে ও তার লোকসান হবে। এইজন্যে সমবায়ের দ্বারা খাঁটি দুধ পাওয়ার আশা বেশী।

ঢাকায় যে সমবায় গোপালন সমিতি হয়েছিল, তাতে আর একটু অন্য জিনিষ দেখান হয়েছিল। আগে যে সব চাষার গরু থাক্‌তো তারা সেইসব গরুর দুধ গোয়ালাদের বেচে দিত। এতে গোয়ালারা সেই দুধ যা ইচ্ছা কর্‌তে পারত। কিন্তু এখন চাষারা ঢাকা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক হতে টাকা নিয়ে এক সমবায় সঙ্ঘ স্থাপনা করে সেইখানে দুধ দুয়ে দিচ্ছে আর সেইখান হতে দুধ বিক্রি হচ্ছে। তাদের দুধের চাহিদা খুব বেশী আর সেইজন্য তাদের লাভও খুব বেশী। তাদের এক বছরের লাভের অঙ্ক হচ্ছে ২২৯১৲।

বাংলাতে এরকম সমিতি গ্রামে গ্রামে হলে চাষীদের যথেষ্ট অর্থাগম হয়। আব তাদের কেবল চাষের উপরই নির্ভর করতে হয় না। সেই জন্য এরকম সমিতির যতো প্রসার হয় ততই ভাল।

সমবায়ের সাহায্যে যে কেবল আর্থিক উন্নতি হয় তা নয়। সমবায় আমাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সবদিকের উন্নতিসাধন করতে পারে। সমবায় সমিতি হতে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনা ক'রে গ্রামে বিদ্যার প্রসার সাহায্য করা যেতে পারে। বিশেষতঃ ঋণদান সমিতিকে পর্য্যন্ত যেখানে শতকরা দশটাকা শিক্ষার জন্যে খরচ কর্‌তে অনুমতি দেওয়া হয়েছে, সেখানে কেবল শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে স্থাপিত সমবায় সঙ্ঘ যে শিক্ষা প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করবে তাতে আর সন্দেহ কী রয়েছে?

এই রকমে দেখা যায় যে, সমবায় সমিতির দ্বারা চাষীর শিক্ষার ব্যবস্থা হতে পারে।

স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে সমবায় বহুদূর কাজ করেছে। যে গ্রামে ম্যালেরিয়া রয়েছে, সে গ্রামে সমবায় দ্বারা ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই কবা সম্ভব হতে পারে। কিছুদিন পূর্ব্বে ডাঃ গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন যে ম্যালেরিয়ার বীজ তার উৎপত্তি-স্থানের আধ মাইলের বেশী দূরে যায় না। এখন বিলেতে ও ইউরোপে নানারকম পরীক্ষা করে এই কথাটার সমর্থন করা হয়েছে। সুতরাং এটা বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে যদি একটা গ্রামের আধ মাইল দূর পর্য্যন্ত মশা জন্মাবার কোন সম্ভব না থাকে তাহলে গ্রামে ম্যালেরিয়া থাক্‌বে না।

সমবায় এ কাজটা কর্‌তে অনেকটা সমর্থ হয়েছে। সব প্রথম গোপাল চাটুয্যে মশায়ই কল্‌কাতা থেকে কিছুদূর পেনেটীতে দুজন বন্ধুর সঙ্গে ম্যালেরিয়া দূর করার জন্যে একটা সমিতি স্থাপনা করলেন। তার কিছুদিন বাদেই পেনেটীর নিকটে শুকচরে ভীষণ ম্যালেরিয়া আরম্ভ হল। গোপাল চাটুয্যে মশায় সঙ্গে সঙ্গে যাতে ম্যালেরিয়া দূর হতে পারে সে রকম ব্যবস্থা করলেন। তাঁরা চাঁদা হতে পাওয়া ২০০০৲ টাকা তাঁরা জঙ্গল সাফ করা, খানা বন্ধ করা, ড্রেন পরিস্কার রাখা, ময়লা জলে কেরোসিন দেওয়া ইত্যাদি নানারকম ম্যালেরিয়া নাশের উপায়ে খরচ কর্‌লেন, ফলে সেখানে ম্যালেরিয়া একেবারে কমে গেল।

ক্রমশঃ ক্রমশঃ সমিতিটীর উন্নতি হয়েছে। এখন আর সাধারণের চাঁদার উপব নির্ভর কর্‌তে হয় না। তাদেরই সভ্য সংখ্যা যথেষ্ট। এখন সে সমিতি নিজেদের টাকাতেই ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই কর্‌তে পারছে। নিখিল বঙ্গীয় ভিত্তিতে এইরকম সমিতিদের একটা সঙ্ঘও হয়েছে।

বাংলার গ্রামে গ্রামে যে এই রকম সমিতির কতো বেশী দরকার তা লিখে বোঝান যায় না। ম্যালেরিয়ায় বাংলার যে কতোবড়ো সর্ব্বনাশ করেছে তা আর বলার নয়। ম্যালেরিয়ায় বাংলার চাষী মর্‌ছে, যারা বাঁচছে তাদের সাহস, বলবীর্য্য সমস্ত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেই সাহসবিস্তৃত বক্ষপট, আশা ভরসার পরিবর্ত্তে আমরা বাংলার চাষীর মধ্যে দেখ্‌ছি যুগ-যুগান্তর হতে সঞ্চিত পাহাড়প্রমাণ নৈরাশ্য বলহীনতা। বাংলার কৃষককে আবার সঞ্জীবিত করতে হলে এই ম্যালেরিয়া দূর করা অবশ্য দরকার। আর সে জন্যে সরকার বা অন্য কারও উপর নির্ভর না করে চাষীদের কর্ত্তব্য হচ্ছে গ্রামে গ্রামে এই রকম ম্যালেরিয়া নিরোধ সমবায় সঙ্ঘ স্থাপনা করা। তাহলে দেখতে দেখতে তাদের অবস্থার যে উন্নতি হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কেবল ম্যালেরিয়া তাড়ান ছাড়াও সমবায় অন্যান্য সামাজিক উন্নতি সাধন করতে পারে। কোন কোন জায়াগায় সামাজিক উন্নতি সাধন সমবায় সঙ্ঘ নাম দিয়া সমবায় সমিতি স্থাপিত হয়েছে। এই সব সঙ্ঘ শিক্ষা দান করে,গ্রামের বাসস্থান যাতে

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে,সে বিষয় চেষ্টা করে। এবং অনেক সময় দুঃস্থদের দানও করে।

বন্যার সময় এ সমিতি বন্যা পীড়িতদের সাহায্যের ভার নেয়, মহামারীর সময় চিকিৎসার বন্দোবস্ত করে। এই রকম একটা সমিতির উদাহরণ হচ্ছে ১৯১৫ সালে ডাঃ ডি, এন, মৈত্র Social Service League বঙ্গীয় সামাজিক উন্নতিসাধন সমিতি নামে যে সমিতিটী করেছিলেন।

এ ছাড়াও মাতৃ-মঙ্গলের জন্য সমিতি স্থাপিত হয়েছে। তারা ধাই প্রভৃতি রেখে মাতৃ-মঙ্গলের চেষ্টা করছে।

এইসব থেকে দেখা যায় যে আমাদের সকল রকম অভাব অভিযোগই সমবায় মেটাতে পারে। আবার সমবায়ে মনের যা উন্নতি হয় সেও অসাধারণ। এতে চাষীরা নিজেরাই নিজেদের অভাব অভিযোগ দূর করতে পেরে এমন একটা আত্মবিশ্বাস লাভ করে যে তার মনে হয় যে সে নিজেই সমস্ত অভাব দূর করতে পারে। তখন যদি আরও একটা বড়ো অভাব এসে তাকে পীড়ন করে তাতেও সে ভয় পায় না। অদ্ভূত আত্ম-নির্ভরতার সঙ্গে সে তার অভাবের বিরুদ্ধে যুঝতে সুরু করে। কাজেই তার এই যে উৎসাহ—সেটা অনেক সময়েই সফল হয়ে আসে। এখন যে জাত আত্ম-অবিশ্বাসে ভরা সে জাতের মনে আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপনা করে তার আপনার অন্তরের সমস্ত ক্ষমতাকে জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে সমবায়ের শক্তি

বড়ো কম নয়। এমন কি অনেক সময় যদি বিশেষ একটা সমবায় সমিতি দাঁড়াতে নাও পারে তাতেও ক্ষতি নেই কারণ সে সমিতি স্থাপনার মধ্যে চাষীদের মনে যে উৎসাহের সঞ্চার হয়ে থাকে সে উৎসাহের দাম অসীম।

সমবায় সম্বন্ধে স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র লিখেছেন—"সমবায় ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার আর এক শুভফল এই হইবে যে ইহা দ্বারা দেশবাসীর স্বায়ত্তশাসন শিক্ষা হইবে। দেশের লোকের কাজ দেশের লোকই করিতে শিখিবে। এইরূপে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ও পরস্পরের প্রতি আস্থা জন্মিলে, দেশে দায়িত্বপূর্ণ শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তনের অন্তরায় সমূহ দূর হইবে। স্বায়ত্তশাসনের যে সুবিশাল হর্ম্ম্য একদিন ভারতের আকাশ-তলে সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতেছি এই সমস্ত সমিতিই তার ভিত্তিপ্রস্তর হইবে।

অধিকন্তু ইহাতে সকলে আত্ম-নির্ভরতা শিখিবে—তাহারা বুঝিবে যে তাহারা জনে জনে ক্ষুদ্রশক্তি হইলেও যখন তাহারা সম্মিলিত হইয়া অন্তরের সহিত কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে তখন রাজপুরুষ ও ধনিবৃন্দের অসাধ্য কার্য্যও তাহারা অনায়াসে পারিবে। দেশের দুঃখ দুর্দ্দিনে তাহাদের মিলিত চেষ্টাই দেশকে বাঁচাইবে।"

আমাদের দেশে সমবায়ের দ্বারা যে কতো উপকার হচ্ছে

পারে তার ইয়ত্তা করা যায় না। আমার স্বর্গত পিতৃদেব বলেছিলেন যে Co-operation is the panacea of most of the evils of the land as it is the best means for the development of the resources of our country. "আমাদের দেশের সবরকম রোগের সর্ব্বৌষধি হচ্ছে সমবায়। আমাদের দেশের যে সব সম্বল আছে, সে গুলি অবলম্বন করে দেশের উন্নতি একমাত্র সমবায়ই কর্‌তে পারে।" কথাটা খুবই সত্য। আমাদের দেশের চাষীর এ কথাটা সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে আমাদের দেশে সমবায়ের যত প্রসার হয় ততই মঙ্গল।

এ অধ্যায়ে সমবায়ের মাত্র গোটা কয়েক দিক্ দেখানো হল, আর তার উপকারের কথা কিছু কিছু বলা হল। কিন্তু যদি চাষীরা অন্তরে অন্তরে সমবায়ের মূল নীতি গ্রহণ করতে পারে, তখন তারা প্রত্যেক বিষয়েই সমবায়ের সাহায্য নিয়ে অসাধ্য সাধন কর্‌তে পারবে, তাদের ক্ষমতা অসীম হয়ে উঠ্‌বে তাদের মনের উৎসাহ অদম্য হয়ে উঠবে, কারণ সঙ্ঘশক্তির বল অসীম।

পঞ্চম অধ্যায়

চাষের প্রণালী।

বাঙ্গালী কৃষক যাহা ভূমি হইতে উৎপন্ন করে; তাহা কিছু অধিক নহে।

বঙ্কিমচন্দ্র

পূর্ব্বে চার অধ্যায়ে কেবল জমি সম্পর্কীয় সমস্যা আর অর্থ সম্বন্ধীয় সমস্যাগুলির আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু জমিতে জলসেচ ইত্যাদি করে জমির উন্নতির ব্যবস্থা করা হতে পারে; সমবায় দ্বারা টাকার জোগাড়ও হতে পারে। কিন্তু যদি চাষের প্রণালী উন্নত না হয়, তবে চাষীর উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। প্রচুর টাকা রয়েছে, জমিও ভাল রয়েছে, কিন্তু চাষা যদি ঠিক সময় মত ভাল বীজ না বসাতে পারে, ঠিক সার না দিতে পারে, ঠিক ভাবে আগাছা পরিস্কার না করতে পারে তা হলে যে ফসল খারাপ হবেই হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেই জন্য এ অধ্যায়ে জমি এবং টাকা ছাড়া চাষে অন্যান্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

এই চাষের সমস্যা তুই দিক হতে দেখা উচিত। প্রথমতঃ বাংলায় এমন কতগুলি সমস্যা আছে যেগুলি প্রত্যেক জেলাতেই দেখা দিয়েছে আর তাদের নিবারণের উপায় প্রায় সব জাগাতেই

এক,—যেমন হালের গরুর সমস্যা প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই এক রকম। আবার অবৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করার সমস্যা প্রত্যেক জেলাতেই আছে। আর এইসব সমস্যা দূরীকরণের উপায় প্রায়ই এক। কিন্তু এ ছাড়াও কতকগুলি সমস্যা আছে যা প্রত্যেক জেলায় বিভিন্নরূপে দেখা দিয়েছে। যেমন যদি বলা হয় একমাত্র ধান চাষের উপর নির্ভর না করে চাষীর অন্যান্য জিনিষের চাষ করাও দরকার, তা হলে প্রত্যেক জেলায় ধরে ধরে কোথায় কি জিনিষ চাষ হওয়ার সম্ভব রয়েছে—সে সমস্ত একটু খুঁটিয়ে বলা উচিত। আমরা বাংলার চাষের সমস্যাকে এই দুই দিক্ থেকেই আলোচনা করার চেষ্টা করব।

সকল জেলার কতকগুলি সমস্যা।

যে সমস্ত সমস্যা বাংলার সকল জেলাতেই দেখা দিয়েছে তাদের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো সমস্যা হচ্ছে আমাদের চাষের অনুন্নত অবস্থা। আমাদের দেশে জমিতে অত্যন্ত সামান্য ফসল হয়। একজন পণ্ডিত লিখেছিলেন আমাদের দেশে যদি কোথাও এক একর জমিতে ২৫৲ টাকার ফসল হয়, তবে সেই খানে জাপানে ১৫০৲ টাকার ফসল হবে। বাজারেও দেখা যাচ্ছে যে জাপানী চাল এ দেশের চালের চেয়ে অনেক সময় সস্তা দামে বিক্রি হয়। জাপানে চাষের এতো উন্নতি হয়েছে।

কিন্তু জাপান যে বাংলার চেয়ে বেশী উর্ব্বর তা বোধ হয় নয়,

বা জাপানে চাষের জমির আয়তনও যে বাংলার জমির চেয়ে খুব বেশী তাও নয়। বাংলায় গড়ে একজন চাষীর ভাগের জমি হচ্ছে ২.০ একর, আর জাপানে তা হচ্ছে ৩.০। বিশেষ যে তফাৎ আছে, তা নয়, কিন্তু অন্যান্য সমস্ত অবস্থা একরকম হওয়া সত্ত্বেও জাপান যে এ তো সস্তা দরে চাল দিতে পেরেছে, তার করণ হচ্ছে যে জাপানীরা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করে এতো বেশী ফসল ফলাতে পেরেছে, যে সস্তা দরে ছাড়ায় তাদের কোন লোকসান হয়নি। অবশ্য এ ছাড়াও অন্যান্য কারণ আছে— যেমন তাদের জাহাজ ভাড়া কম, চাষীর জীবনযাত্রা বেশী ব্যয় সাধ্য নয় ইত্যাদি। কিন্তু তাহলেও প্রধান কারণটা হচ্ছে যে তাদের ফসলের পরিমাণ বাংলার প্রায় ছ'গুণ এবং এই সুফসলের কারণ হচ্ছে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ।

এই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ বল্‌লে আমরা কি বুঝি সে কথা আলোচনা করতে হলে চাষের প্রত্যেক উপকরণ নিয়েই আলোচনা করতে হবে। চাষের সর্ব্বপ্রধান উপকরণ হচ্ছে লাঙল। কিন্তু আমাদের বাংলার লাঙল যে খুব ভাল তা মোটেই নয়। বরং বাংলার লাঙল অনেক সময়ে চাষের পক্ষে ততটা উপযুক্তই নয়। বাংলার লাঙলে সাধারণতঃ এক ইঞ্চি বা আধ ইঞ্চি গভীর গর্ত্ত হয় এবং তাতে কেবল জমি বিভক্তই হয়, উল্টে গিয়ে নীচের জমি উপরে ও উপরের জমি নীচে যায় না। এতে উপরের সামান্য জমিই নাড়াচাড়া পায় এবং তারাই

কিছু পরিমাণে হাওয়া থেকে ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় অক্‌সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি জোগাড় করে। কিন্তু নীচের জমিতে সে সব কিছু না থাকায় কেবলমাত্র উপরের জমি হতেই ফসলের খাদ্য সংগ্রহ হয়। উপরের জমিটাই কেবলমাত্র ফসলের খাদ্য জোগাতে জোগাতে ক্রমশঃ সারহীন হয়ে পড়ে এবং ফসলও খারাপ হতে আরম্ভ করে। একবছর ফসলের জন্যে জমির যে শক্তি ক্ষয় হয়, পরের বছর বাংলায় যে রকম গভীর চাষ সাধারণতঃ চলে, ততটুকুতে তারা আবার সে লুপ্ত শক্তি উদ্ধার করতে পারে না। এইজন্য বাংলার জমি উর্ব্বরতা ক্রমশঃ ক্রমশঃ কম্‌ছে আর ফসলও সেইজন্যে কমে যাচ্ছে।

কিন্তু জমি যদি আরো একটু গভীর চাষ করা হয়, তা হলে এ অসুবিধা বহু পরিমাণে দূর হতে পারে। তা'হলে নীচের জমি পর্য্যন্ত হাওয়া থেকে বা মানুষের দেওয়া সার থেকে নিজেদের শক্তি সংগ্রহ করতে পারে এবং এই রকমে ফসলেরও অনেক উন্নতি হতে পারে। কিন্তু এই গভীর চাষ বাংলার এ লাঙলে হওয়া সম্ভব নয়। এই গভীর চাষ কর্‌তে হলে একটু ভাল লাঙলের দরকার। নীচে কয়েকটা ভাল লাঙলের পরিচয় দিচ্ছি।

এই উন্নত ধরণের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ লাঙল হচ্ছে যেটা পাঞ্জাবে চলেছে—সেই পাঞ্জাব লাঙল। এতে ফসলের অসাধরণ

উন্নতি দেখা গিয়েছে। এর লোহার ফলার উপরেই একটা চওড়া লোহার পাত থাকে ইংরাজীতে তার নাম **mould board.** এই পাতটার ফল হচ্ছে যে নীচে হতে যে মাটীটা উঠে সেটা বেশী দূর ছড়িয়ে না গিয়ে কাছাকাছি উল্টে পড়ে, আর তারপর যখন সেইটেকে মই দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয় তখন নীচের মাটীটা উপরে চলে আসে আর উপরের মাটীটা নীচে চলে যায়। এই রকমে চাষের উন্নতি সাধনের জন্য এটা খুব উপকারী। আর তা ছাড়া এতে ফলাটাকে বাড়াবার বা কমাবার ব্যবস্থা আছে। তাতে ইচ্ছামত বেশী গভীর বা কম গভীর চাষ করা যায়। এটাতে এতো ব্যবস্থা থাকলেও এটা খুবই হাল্‌কা,—এমন কি বাংলার প্রচলিত লাঙলের চেয়ে যে বেশী ভারী তা নয়। এক কথায় উন্নত লাঙলের এইটীকেই আদর্শ বলা যেতে পারে। কিন্তু বাংলায় এর প্রচলন হওয়া সম্ভব নয়, কারণ এর দাম অত্যন্ত বেশী,—৫৫৲।

কিন্তু পাঞ্জাব লাঙল হবার পর তার অনুকরণে এরকম আরও অনেক লাঙল বেরিয়েছে।

এর মধ্যে লেসলি কোম্পানী একটা বের করেছেন তার নাম হচ্ছে প্লানেট; তার দাম ২৫৲ টাকা কিন্তু কাজ ভাল হয়। তাঁদের আরও কতকগুলি ভাল লাঙল রয়েছে যেমন হিন্দুস্থান (দাম ১৯৲) মেসটন (দাম ১২৲) এসবের মধ্যে লোহার উৎকৃষ্টতা অপকৃষ্টতা হিসেবে তফাৎ থাকলেও কাজ অনেকটা সমানই হয়।

কিন্তু এ যে লাঙল এও চাষার সাধ্যায়ত্ত নয়। চাষার সাধ্যায়ত্ত করার জন্যে গভর্ণমেণ্ট ফার্ম্মে নানারকম লাঙল তৈরী করা হয়েছে। যেমন ঢাকায় সাবকম নামে আর একটা করা হয়েছে, তার দাম আট টাকা। রাঁচি গভর্ণমেণ্ট ফার্ম্মে 'বিহার' নামে একটা লাঙল করা হয়েছে তার দাম ৫৲ টাকা। এইসব লাঙলগুলি চাষার অনেকটা সাধ্যায়ত্ত বলে মনে হয়। চাষা যদি এগুলি ব্যবহার করতে পারে, তা'হলে তার ফসল বৃদ্ধি হবার যথেষ্ট আশা রয়েছে।

খালি লাঙল নয়,—অন্যান্য ব্যাপারেও চাষার একটু উন্নত ধরণের জিনিষ ব্যবহার করা দরকার। সাধারণতঃ চাষী একটা মই ব্যবহার করে কেবলমাত্র একটা বাঁশ দিয়ে। কিন্তু একটা বাঁশ জমির উপর দিয়ে গেলে তার ঢেলাও ভাল করে ভাঙে না। আর তাছাড়া কেবল ঢেলা ভাঙা ছাড়াও মই দেওয়ার যে আর একটা উদ্দেশ্য রয়েছে সেটা এতে সার্থক হয় না। মই দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যে উপরের মাটীটাকে এমনভাবে বিছিয়ে দেওয়া যাতে ভেতর হতে জলীয় অংশ উড়ে না গিয়ে মাটীতেই থাকে। বাংলার চাষীরা একে বলে বতর দেওয়া। কিন্তু কেবল একটা বাঁশ দিয়ে মই দিলে জমিটা সে রকম সমানভাবে বিছান হয় না আর তাতে বহু জলীয়বাষ্প উড়ে যায় এবং সেইজন্যে ফসলেরও কম বেশী হানি হয়। কিন্তু যদি একটা লম্বা কাঠে দুটো ফুটো করে মই দেওয়া হয় তবে

দেখা যাবে যে তাতে ফল অনেক ভাল হচ্ছে। বাংলার কোন কোন জায়গায় এর প্রচলন রয়েছে। তেঁতুল বাবলা বা কোন চিম্‌ড়ে কাঠ—চার হাত লম্বা—চওড়া দশ আঙূল, ঘনতা বা উঁচু আট আঙ্গুল। সেই কাঠের মধ্যে প্রায় তিনহাত লম্বা ৫" চওড়া ৪" ইঞ্চি গভীর করে। কাঠ কুরে বার করে নিয়ে এই মই তৈরী হয়। এর নাম হচ্ছে চৌকী। এতে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়।

চাষীরা প্রায়ই মনে করে যে এসব নতুন নতুন ব্যাপার তাদের জন্যে নয়। যেমন ট্র্যাক্‌টর দিয়ে চাষের সঙ্গে তাদের কোন সম্বন্ধই নাই তেমনি এর সঙ্গেও যে তাদের কোন সম্বন্ধ আছে বলে মনে হয় না। তারা কেবল চেয়ে চেয়ে এইসব উন্নত প্রণালীতে চাষের ব্যবস্থা দেখে, তাতে কতো লাভ হতে পারে সে সব শোনে ও কিন্তু তারা সেগুলোকে নিতে পারেনা ; এ যেন তাদের রূপকথা শোনার মতো, বাস্তবের সঙ্গে যেন কোন যোগেই নেই। তারা এটা মনেই করতে পারেনা যে এটা তাদেরই জন্য এবং তাদেরই সম্পূর্ণ নিজের জিনিষ করবার জন্যই তৈরী করা হয়েছে কেবল বই এ লিখবার জন্য বা লেসলী কোম্পানীর দোকান সাজবার জন্য নয়। কিন্তু তাদের এই ভয় নেহাৎ অমূলকও নয়। একেবারে হয়তো আমরা বাংলার সমস্ত লাঙ্গল ফেলে দিয়ে নতুন নতুন হাল ব্যবহার করলে সে প্রচেষ্টার ফল পাঞ্জাবের গুরগাঁও প্রচেষ্টার মতোই হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

কাজেই এ জিনিষগুলোকে সত্যি সত্যি ব্যবহারে আনতে হলে এ জিনিষটাকে চাষীর নিজের জিনিষ করিয়ে দিতে হবে। চাষী যেমন জানে যে যার পৈত্রিক লাঙ্গলের উপর তার সম্পূর্ণ দখল রয়েছে, সেটা তারই হাতের জিনিষ তেমনি সে যদি এ লাঙলগুলিকেও তার নিজের হাতের জিনিষ বলে মনে করে তা হলেই এগুলো সার্থক হবে, তা নইলে নয়। আর এরকম লাঙল না হলে গ্রামের কামার দ্বারা তার মেরামতি কাজ সম্ভব হয়ে উঠবে না। কিন্তু বারে বারে যদি সহর হতে লাঙল মেরামত করাতে হ'লে এরকম ধরণের লাঙল কখনও চাষাদের নিজের জিনিষ হবে না।

এগুলোকে চাষীদের নিজের জিনিষ করিয়ে দিতে হলে বাংলার লাঙ্গলের মধ্যে মধ্যে এই সব লাঙ্গল এক একখানা করে ঢোকান দরকার। ক্রমশঃ নাড়তে নাড়তে এ জিনিষের উপরেই তাদের এমনই একটা দখল আসবে যে তারা তখন লাঙ্গলের আবিষ্কর্ত্তাদের চেয়ে আরও বেশী বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সেগুলো ব্যবহার করবে।

একটা জায়গায় চাষীরা দেশী হালে চাষ করেছে, তার মধ্যে যদি একজন লোক একখানা উন্নত লাঙ্গল নিয়ে গিয়ে তাদের পাশাপাশি চাষ আরম্ভ করে দেন, তখন তারা ক্রমশঃ এর দিকে লক্ষ্য দেবে আর শীঘ্রই এসব জিনিষকে নিজেদের দখলে আনবে। এ ছাড়াও লেসলি কোম্পানী এইসব নূতন জিনিষ

চালাবার জন্যে একটা সুন্দর উপায় বার করেছিলেন। তাঁরা একটা গ্রামে একদিন একটা যন্ত্র সকলের দেখে শুনে নেবার জন্যে রেখে দিলেন। তারপর একদিন ঘোষণা করা হল যে যে সবচেয়ে ভালভাবে সেই যন্ত্রটা ব্যবহার করতে পারবে তাকে কিছু টাকা দেওয়া হবে আর সেই যন্ত্রটা উপহার দেওয়া হবে। এরকম করায় তাঁরা সহজেই অনেক জিনিষ বিক্রি করাতে পেরেছিলেন এবং সে জিনিষগুলি চাষীরা ভালভাবে কাজে লাগিয়ে অনেক ফসল বাড়াতে পেরেছিল।

চাষীরা আর একটা ভয় করে যে এসবে তাদের খরচ পোষাবে না। কিন্তু তা নয়। প্রথমে তাদের খরচ কিছু বেশী হবে বটে কিন্তু তাদের ভাল ফসল হওয়ায় তাদের সে খরচ পুষিয়ে লাভ থাকবে। নীচে একটা হিসেব থেকে মোটামুটী এ কথাটা পরিস্কার হবে।

চাষীরা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত জিনিযগুলি কেনে (৪ একরের জন্য)

১টা লাঙল— ৩৷৷০
১টা জোয়াল— ৷০
১টা আঁচড়া— ৸০
১টা মই— ২৲
৩টা কোদাল— ৩৸০
৩টা নিড়ানী— ৸০

৪টা কাস্তে—	২৲
১টা মুগুর—	৷৹
	১৩৷৷৹

এর বদলে তারা ফসল পায় ধান ২১৬৲ কিন্তু তারা যদি মোটামুটী

১টা লাঙল কমবেশী—	১০৲
১টা জোয়াল—	৷৹
১টা আঁচড়া—	১৲
১টা মই—	২৷৷৹
৩টা কোদাল—	৩৸৹
৩টা নিড়ানী—	৸৹
৪টা কাস্তে—	২৲
১টা মুগুর—	৷৹
	২১৲

এই রকমে তারা যদি আন্দাজ ৮৲ টাকা বেশী খরচ করে তাহালে অন্ততঃ তাদের শতকরা ১০ ভাগ ফসল বাড়বে এবং শতকরা দশভাগ ফসল বাড়া মানে ৪০৲ টাকা বাড়া। তাহলে দেখা যাচ্ছে খরচ খরচা পুষিয়েও তাদের ৩২৲ টাকা লাভ থাকল। সুতরাং চাষীদের এসব নতুন জিনিষে লোকসান হবে বলে ভয় খাবার কিছু নেই, এতে তাদের লাভই হবে। আবার আধুনিক পাম্পিং যন্ত্রাদি ব্যবহারে কি রকম লাভ পরপৃষ্ঠার হিসাব হতে তা পরিস্ফুট হবে।

১	সেচপ্রাপ্ত শস্যের নাম	ধান	আখ
২	প্রতিদিন কয় ঘণ্টা কাজ হইয়াছে	৬ ঘণ্টা	ঐ
৩	কি পরিমাণ স্থানে সেচ হইয়াছে	৪॥	৩৮
৪	ইঞ্জিন ও পাম্পের তৈল খরচ	কেরোসিন ৬ ঘণ্টায় ৮ই বোতল	(২ পাঁইট বোতল)
৫	লুব্রিকেটিং তৈলের পরিমাণ	ইঞ্জিন ও পাম্পে ৬ ঘণ্টায় এক পাঁইট	
৬	৬ ঘণ্টার তৈলের মূল্য	১॥/১০	১॥/১০
৭	৬ ঘণ্টার লুব্রিকেটিং তৈলের মূল্য	॥৵	॥৵
৮	একজন কুলী ও মিস্ত্রীর বেতন	কুলী ॥০ মিস্ত্রী ১॥০	২৲
৯	দৈনিক ৬ ঘণ্টার প্রকৃত খরচ ৬, ৭, ৮ ঘরের যোগফল	৪৶১০	৪৶১০
১০	এক একর জমিতে সেচের খরচ	১৭॥৶৫	১৭॥৶৫
১১	প্রতি একরে সেচের খরচ	২০৲	২০৲
১২	সাক্‌সান হেড্	১৫	১৫
১৩	প্রতি ঘণ্টার জলের পরিমাণ	৬,৫০০ হইতে ৭০০০ গ্যালন	৬,৫০০-৭০০০

আধুনিক পাম্পিং যন্ত্রাদি ব্যবহারে সেচের খরচের সঙ্গে লাভের তুলনা। *

ভূমি পরিমাণ	যে শস্যে সেচের পরীক্ষা হইয়াছে	প্রতি একরে বর্দ্ধিত শস্যের পরিমাণ
সিক্ত ভূমি ৩০ কাঠা শুষ্ক ভূমি ১২ কাঠা	আখ	৩।৪৬/ ছটাক ২৯৬/০
সিক্ত ভূমি ৩ কাঠা শুষ্ক ভূমি ৩ কাঠা	পুসা গম	২।৮৩/ ছটাক ১৪৬/০

ভূমি পরিমাণ	যে শস্যে সেচের পরীক্ষা হইয়াছে	বর্দ্ধিত শস্য পরিমাণ
সিক্ত ৩ কাঠা শুষ্ক ৩ কাঠা	দার্জ্জিলিং আলু	১০৬০ সের ২৬৬৩/০
সিক্ত ১ কাঠা শুষ্ক ১ কাঠা	স্থানীয় আলু	১১।০ সের ২৮৩/০

এই রকম ভাবে ধীরে ধীরে চাষীদের মনের ভয় ভেঙ্গে দিয়ে ধীরে ধীরে যতটা প্রয়োজন ততটা এইসব উন্নত প্রণালীর যন্ত্রপাতি ঢোকাতে হবে। প্রথমে যা খরচ পড়ে সে লাভের তুলনায় সামান্য হলেও অনেক সময় চাষীদের পক্ষে বেশী হয়ে

* সতীশ চন্দ্র মিত্র "বাংলার কৃষিশিল্প" ১৪৮ পৃঃ।

পড়ে, সে অভাব দূর করবে সমবায়। আর এই যে সব প্রচার কাজ এসব করবেন সমবায়ের প্রচারক সংঘ, গ্রামের বুদ্ধিমান লোকেরা আর জমিদার, কারণ তাঁরা লাঙল ধরে চাষ না করলেও কৃষির উপরই তাঁদের নির্ভর। আর এসব জন্যে যন্ত্র প্রস্তুত-কারের যথেষ্ট সুবিধা দিচ্ছেন। তাঁরা অনেক সময়েই সমবায় সমিতিকে সুবিধা দরে জিনিষ বিক্রি করেন।

এই গেল মোটামুটী ভাবে হাল লাঙলের কথা। তার পরই আমাদের মনে পড়ে যারা হাল চালাবে সেই গরুর কথা। হালের গরুর সমস্যা এখন আমাদের একটা বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের গায়ে জোর নেই, সারা বছর তারা খেতে পায় না। কেবল যে সময় তাদের কাজ করতে হয় সেই সময় তারা খেতে পায়,—তাও বোধ হয় যথেষ্ট পরিমাণে নয়। তাদের ভাল থাকবার জায়গা নেই অপরিষ্কার জায়গায় থেকে বৃষ্টিতে ভিজে শীত সহ্য করে তাদের শরীরের সামর্থ্য কমে যায়। তারপর যখন গোমড়ক হয়, তখন তার নিবারণের উপায়ের কোন বন্দোবস্তই নাই। এক কথায় বল্‌তে গেলে গরুর দুর্দ্দশা যতদূর হতে পারে হয়েছে।

কিন্তু যার উপরে হাল চষার একমাত্র নির্ভর, তার যদি এরকম দুর্দ্দশা হয় তবে আমাদের চাষের যে অবনতি হবে এটা একেবারে সুনিশ্চিত। আর সেইজন্যে গরুর সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার হয়ে পড়েছে।

বাংলায় প্রায় ২৫ লক্ষ গরু মহিষ রয়েছে। তার মধ্যে ষাঁড় হচ্ছে ১-২ লক্ষ, বলদ ৮-৪ লক্ষ, গরু ৮-৩ লক্ষ আর বাছুর ৬-৩ লক্ষ। মোষের মধ্যে ষাঁড় ৬ লক্ষ, মহিষী ২ লক্ষ, বাছুর ১ লক্ষ। আর চাষ করা হয়েছে এমন ১০০ একর জমিতে বাংলায় ১০৮টা করে গরু (গরু অর্থে গরু মহিষ সবই) রয়েছে।

কিন্তু এত গরু বাংলায় থাকা সত্ত্বেও যে বাংলার চাষ এতো অনুন্নত এর একটা প্রধান করণ হচ্ছে যে আমাদের দেশে গরুর উপযুক্ত পুষ্টি হয় না। আমাদের দেশে গরু চরবার জায়গা অত্যন্ত কম রয়েছে। হিসেব করে দেখা গিয়েছে ফরিদপুর জেলায় ১ একর জমিতে ৬৯টী গরুকে চরতে হয়েছে। নোয়া-খালিতে ৫৫, হাওড়ায় ৪৫, বগুড়ায় ৪০ ইত্যাদি। এই হতেই দেখা যায় যে চ'রে খাবার জায়গা অত্যন্ত অল্প থাকায় গরুরা ভাল করে খেতে পায় না ; তাও যেটুকু জায়গা রয়েছে সেটুকুতেও যদি গরুর পক্ষে স্বাস্থ্যকর বড়ো বড়ো ঘাস বা অন্য কোন খাবার থাকতো তা হলেও কিছু পরিমাণে এ দুর্দ্দশার লাঘব হত। কিন্তু যাঁরা পাড়াগায়ের দৃশ্য একবার দেখেছেন তাঁরাই জানেন যে সামান্য ঘাস ছাড়া সেখানে কিছু নেই, তাও আবার সে ঘাস সারা বছর থাকে না।

যদি ঘরে প্রচুর খেতে পায় তাহলেও বাইরে চরে খাবার বিশেষ দরকার হয় না। ঘরে একটা সুস্থ গরুর কতোটা খাবার দরকার সে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন—

২ সের ভূষি

২ সের চূনি

১½ সের তুলোর বীচি কিংবা ২ সের খোল

১ ছটাক নুন

১৫ সের খড় বা ২৫ সের কাঁচা ঘাস *

এ হতে দেখা যায় খড় বা ঘাসের উপরেই গরুর প্রধান নির্ভর। এর মধ্যে ঘাসেরই উপকারিতা বেশী।

কিন্তু আমাদের দেশের গরু সাধারণতঃ এর চেয়ে অনেক কম পায়। এইজন্যে তাদের স্বাস্থ্য ক্রমশঃই খারাপের দিকে চলেছে।

গরুর স্বাস্থ্যোন্নতি করতে গেলে তাদের খাবারের সমস্যাটার সমাধানই সব চেয়ে বেশী দরকারী। খাবারের মধ্যে খড় বাড়ানোর মধ্যে অনেক গণ্ডগোলের সম্ভাবনা আছে, কারণ বেশী ধান হলেই চালের দর কমবে আর তাতে চাষীর সর্ব্বনাশ। কিন্তু ঘাস বা গরুর অন্যান্য ঘাস জাতীয় খাবার বাড়াতে এ সব কোন গণ্ডগোলের আশঙ্কা নেই।

---

* এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মত হচ্ছে যে গরুর দুধের শতকরা ৪০ ভাগ খাবার দেওয়া উচিত। তার মধ্যে শুক্‌নো জিনিষ যদি দেওয়া হয় ১০ ভাগ, কাঁচা ঘাস প্রভৃতি কাঁচা জিনিষ দিতে হবে ৩০ ভাগ। কেউ কেউ বলেন যে খোল বা তুলার বীচির পরিবর্ত্তে ১ সের যব দেওয়া চলে। বাংলা দেশে এ প্রথার তত চলন নেই।

চালের দর এখনও কমে রয়েছে। কাজেই যদি এখন কিছুদিন ধান চাষ কিছু কম হয় তাতেও ক্ষতি নেই। * সেই জন্যে চাষীর উচিত হচ্ছে এমন কি কিছু ধানের জমি বাদ দিয়েও গরুর খাবারের চাষ করা। এইরকম খাবারের মধ্যে প্রধান হচ্ছে নেপিয়ার ঘাস ও হাতি ঘাস। পাট যে মাটীতে হয় নেপিয়ারও সেই জমিতে হতে পারে। কেবল এইটুকু মনে রাখা দরকার যে এ যদি জলে ডুবে যায় তাহলে মরে যাবে। বর্ষার আগে জমি চাষ করে কিছু সার দিয়ে তারপর ঘাসের কাটিং বসানো দরকার। তারপর বর্ষার জলে আপনাআপনি এ ঘাস বেড়ে উঠবে। লাগানোর মাস খানেকের মধ্যেই এ ঘাস এতটা বেড়ে উঠবে যে এর উপরটা কেটে নিয়ে গরুকে খাওয়ান চলবে। সাধারণতঃ বিঘা প্রতি ২০০।৩০০ মণ ফলন হয়। মাঝে মাঝে সেচ দিলে ৫০০ মণ পর্য্যন্ত হতে পারে। আর গরুর পক্ষে এ ঘাস এত পুষ্টিকর যে তা আর বলে শেষ করা যায় না। হাতিঘাসে নেপিয়ারের মত যত্ন নিতে হয় না। জলও কম লাগে, খুব উঁচু জায়গাতেও এ হতে পারে। সেইজন্যে পশ্চিম বাংলার উঁচু জমিতে এ ঘাস খুব হতে পারে এবং এ হতে গরুরা যথেষ্ট উপকার পাবে।

---

* সেই সঙ্গে এটা মনে রাখা উচিত যে কেবল এই জন্যই যে ধানের চাষ কমাতে হবে তার কোন মানে নাই। এখনো আমরা জাপান ও বর্ম্মা থেকে চাল আমদানী কর্‌ছি। সে আমদানীটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

বর্ষা বা গ্রীষ্মকালে যখন ঘাস পাওয়া যায় না তখন এই কাঁচা নেপিয়ার ঘাস বা হাতিঘাসের ব্যবস্থা রাখা খুবই দরকার। যখন হাতি ঘাস হয় তখন সেই ঘাস কেটে নিয়ে একটা বাঁধান গর্ত্তের মধ্যে ফেলে উপরে মাটী চাপা দিয়ে রেখে দিলে সে ঘাস খুব ভাল থাকবে। আর তাতে এমন একটা সুগন্ধ হবে, যাতে গরুরা সেটা আরো আগ্রহের সঙ্গে খাবে। এই রকম উপায়ে বর্ষা বা গ্রীষ্মকালে কাঁচা ঘাসের ব্যবস্থা অতি সহজ উপায়ে হতে পারে। যদি প্রথম প্রথম চাষীরা এ বিষয়ে এগুতে না চায় তবে সমবায় সমিতি হতে এই সব প্রথম আরম্ভ করা উচিত।

গরুর খাবার ছাড়াও আর একটা সমস্যা আছে সেটা হচ্ছে গরুর জাতির উন্নতিসাধন। সাধারণতঃ আমাদের দেশে ভাল ষাঁড় না থাকায় এবং ভালভাবে বিবেচনার সঙ্গে তার ব্যবহার না হওয়ায় আমাদের গরু দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। সেই জন্য ভাল ভাল ষাঁড় হতে যদি সবল বাছুর হয় তবে আমাদের চাষের অনেক উন্নতির আশা করা যায়। তবে এ বিষয়ে খুব সাবধানে অগ্রসর হওয়া উচিত। পাঞ্জাবে একেবারে দুলক্ষ ষাঁড় কেনা হয়েছিল, তাতেই গুরগাঁও আদর্শ গ্রাম স্থাপনের কল্পনা ভুমিসাৎ হয়ে গেল। সেই জন্যে বাংলায় একেবারে ওরকম কিছু না করে আমাদের দেশেরই ষাঁড়কে খাইয়ে তাকে সবল সুস্থ বা কাছাকাছি কোন প্রদেশ হতে ষাঁড় আনিয়ে

চেষ্টা করে দেখা উচিত। এটা গভর্ণমেণ্ট ফার্ম্মে চেষ্টা করা হয়েছে এবং সেখানে ভাল ভাল ষাঁড়ও রাখা হয়েছে। গ্রামে গ্রামে সমবায় সমিতিরা এরকম কাজ করতে পারেন।

গরুর উন্নতির জন্য আর একটা জিনিষ দরকার। পাঞ্জাবে গরুর উন্নতির জন্য গরু বীমা সমিতি হয়েছে। তারা গরুর দুধ বিক্রি করার ভার নেবে। গরুর অসুখ করলে চিকিৎসা করবে, হালের গরু হলে কিছু কিছু ফসল বিক্রি করতে প্রতিশ্রুতি দেবে। কিন্তু এর পরিবর্ত্তে তারা দেখে নেবে যে গরুকে ঠিকভাবে খাওয়ান ও যত্ন হচ্ছে কিনা আর তার সুস্থ সবল বাছুর যাতে হয় তার চেষ্টা করা হচ্ছে কিনা। এতে পাঞ্জাবে অদ্ভুত ফল পাওয়া গেছে। সেখানে গরু খুব শক্তিশালী, দুধ যথেষ্ট দেয়, হালের গরুর যথেষ্ট ক্ষমতা থাকায় ফসল ভাল হয় এবং এ হতে সদ্য সদ্য বা পরোক্ষে আরও নানা রকম সুবিধা পাওয়া গিয়াছে। আমার মনে হয় বাংলার গ্রামে গ্রামে এই রকম সমিতির প্রচার হওয়া দরকার।

আমাদের দেশে গরু বেশী দুধ দেয়না। আমাদের দেশের দুধের অভাব আমাদের গরুর দুধে মেটে না। বিদেশ হতে বছরে ২৬৫৭৫৭৲ টাকার মাখন আর ২,১৯,১৩৪৲ টাকার পনির বাংলা দেশে আমদানি হয়। যদি আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমানে দুধ হয়ে যদি এই অভাব দূর করতে পারে, তাহলে অন্ততঃ এই ৫ লাখ টাকা চাষীদের মধ্যে বিতরিত হবে তাতে

কোন সন্দেহ নেই। আর তাছাড়া যদি বেশী দুধ হয় তবে আমরা দেশের অভাব মিটিয়ে অন্য দেশে দুধ হতে তৈরী জিনিষ পাঠিয়ে টাকা আন্‌তে পার্‌বো না কেন ?

সেই জন্য গরুর অবস্থার দিকে মনোযোগ দেওয়া বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে। গ্রামে গ্রামে সমবায় সমিতি এইদিকে লক্ষ্য দিন, সেই সঙ্গে গরু বীমার বন্দোবস্ত হোক্‌ চাষীরা গরুর খাবার চাষ করুক ; এতে আমাদের গরুর উন্নতি অবশ্যম্ভাবী আর তাহলে আমাদের চাষেরও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

হালে গরু জুড়ে জমি চষার পর সার দেওয়ার কথাই আমাদের মনে আসে। বাংলার জমিতে সার যতোটা দরকার ততোটা প্রায়ই দেওয়া হয় না। এইজন্য বাংলার জমির উর্ব্বরতা শক্তি ক্রমশঃ ক্রমশঃ ক্ষয় পেয়ে আসছে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে চাষী জমিতে গোবর সার দেয়, বা যেখানে সম্ভব সেখানে জমিতে সার হিসেবে কিছু পাঁকমাটী ফেলে দেয়। তাছাড়া ফসল হিসেবে কখনও কিছু ছাই দেয় বা অন্যান্য সামান্য সামান্য কোনও সার দেয়। গোবর সারই চাষীর প্রধান সার ; কিন্তু গোবর সারও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া চাষীর পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু দুবার ফসল পেতে হলে, বা এমন কি একটা ফসলও ভাল ভাবে পেতে হলে উপযুক্ত সার দেওয়া দরকার। আবার সে সার বিভিন্ন ফসলে বিভিন্ন রকমের হবে কারণ বিভিন্ন

ফসল মাটী হতে বিভিন্ন রকমের জিনিষ চায়। যেমন দেখা যায়, অড়হর জমি থেকে কেবল নাইট্রোজেন বেশী চায়। আবার দেখতে পাওয়া যায় যে একটা ফলগাছ ফল ফলাবার জন্য জমি হতে বেশী পরিমাণে ফস্‌ফোরস্‌ চায়। কিন্তু আমরা যদি অড়হরে এমন একটা সার দি, যাতে ফস্‌ফোরস্‌ বেশী রয়েছে বা ফলগাছে এমন একটা সার দি, যাতে নাইট্রোজেন বেশী রয়েছে তা হলে সে সারের কোন উপকারিতাই হবে না। কিন্তু ফলগাছে যদি এমন একটা সার দেওয়া হয় যাতে বেশী পরিমাণে ফস্‌ফোরস্‌ রয়েছে আর যার জমি হতে ফস্‌ফোরস্‌ সংগ্রহ করে গাছের কাছে এনে দেবার ক্ষমতা রয়েছে, তা'হলে আমরা দেখতে পাব যে গাছে যথেষ্ট ফল ফলেছে আর সে ফল খুব মিষ্টি হয়েছে।

গোবরে সবরকম জিনিষই কিছু কিছু রয়েছে বলে গোবর সার সবেতেই চলে। কিন্তু আমরা যদি এক একটা ফসল বুঝে তার দরকারী যে জিনিষ কেবল সেই জিনিষটাই জুগিয়ে দিতে পারি, তা'হলে আমরা গোবরের চেয়ে অনেক বেশী লাভ পাব। আর কেমিক্যাল সার সেই এক একটী জিনিষ,—তারমধ্যে এক একটা জিনিষের প্রাধান্য রয়েছে। নীচে কেমিক্যাল সারে যে কতো বেশী লাভ হয় তার একটা হিসেব দিচ্ছি—

সারের নাম ও পরিমাণ	একর প্রতি ফসলের পরিমাণ (১২ বছরের গড়)		একর প্রতি লাভ (৩ বছরের গড়)	একর প্রতি সারের দাম (৩ বছরের গড়)
	ধান	খড়		
১। বিনা সারের জমি	১৭ মণ ৭ সের	২৭ মণ ৭ সের	১৬।৶০	০
২। খোল (৬ মণ)	৩৯ মণ ২ সের	৫৭ মণ ৩৪ সের	৫০।/০	১২৲
৩। গোবর সার (৫০ মণ)	৪৩ মণ ১০ সের	৫৭ মণ ৩৫ সের	৫৮৸০	২৶০
৪। হাড়ের সার (৩ মণ)	৪৫ মণ ৩১ সের	৬৪ মণ ২ সের	৮০৸৶০	৫॥০
৫। হাড়ের সার (৬ মণ)	৪৯ মণ ২১ সের	৬৮ মণ ৩৪ সের	৮৪॥৵০	১১৲
৬। হাড় ৩ মণ সল্টপিটার ৩০ সের	৫৪ মণ ৩৪ সের	৭৭ মণ ৭ সের	১০৫৲	৯।০

বৰ্দ্ধমানে গভর্ণমেণ্টের যে ফার্ম আছে সেইখানে ধান ক্ষেতে পরীক্ষা করে এই ফল পাওয়া গেছে। এ হতে দেখা যায় যে শেষ নম্বরের সারটাই ধানের পক্ষে সবচেয়ে ভাল। আর এর খরচ গোবর সারের চেয়ে মোটে ৭৲ টাকা বেশী, কিন্তু লাভ হচ্ছে ধান প্রায় ৫ মণ বেশী আর খড় প্রায় ৭ মণ বেশী। ৫ মণ ধানের দাম ২০৲ টাকা আর ৭ মণ খড়ের

দাম প্রায় ১৷৷০। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ৭৲ টাকা বেশী খরচ করে সে ২১৲।২২৲ টাকা লাভ করছে অর্থাৎ তার ১৫৲ টাকা খাঁটি মুনফা থাকছে। যার বাৎসরিক মুনফা ৯৲ টাকা মাত্র (তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য) তার ১৫৲ টাকা লাভ থাকা বড় সোজা কথা নয়। কাজেই এ অবস্থায় দেখা যায় যে, চাষীর গোবরসার ছেড়ে শেষোক্ত সারটাই দেওয়া উচিত, কারণ তাতে তার লাভ অনেক বাড়বে। সমবায় সমিতিগুলি এইসব সার রাখবেন আর চাষীরা সেইখান হতে কিনে নিয়ে যাবে। যদি তাদের সে সময় টাকা না থাকে তবে সমবায় ঋণদান সমিতি এসব বিষয়ে সাহায্য করবেন।

ধানে সার নিয়ে ততোটা বেশী বেশী মাথা ঘামাবার দরকার হয়না, যতোটা বেশী দরকার হয় তরি-তরকারী বা অন্যান্য ফলগাছ নিয়ে। এখন যদি সার দেওয়ার ফলে ধানে পর্য্যন্ত এরকম বেশী আয় করতে পারা যায়, তা'হলে তরি-তরকারী বা বড়ো ফলগাছে ভাল ভাবে সার দিলে যে কতো বেশী আয় হবে তা বলার নয়। এইজন্য আমাদের এখন সারের দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত আর এই যে বৈজ্ঞানিক সারের উপরে চাষীদের একটা বিজাতীয় ভয় রয়েছে সেটাও যাতে আস্তে আস্তে দূর হয়ে যায়, সে বিষয়েও চেষ্টা করা উচিত।

আরও দুটো সার আছে যেটা খুব সহজে পাওয়া যায়। খরচ নেই বল্‌লেই চলে আর যার ক্ষমতাও খুব বেশী। প্রথমটী

হচ্ছে Farm-yard manure আর দ্বিতীয়টী হচ্ছে Green manure বা সবুজসার। প্রথমটী অতি সহজেই পাওয়া যায়। যতো পাতা ঘাস লতা পাওয়া যায় সব জড়ো করে এক জায়গায় বিছাতে হয়। তার উপরে একবার গোবর দিয়ে আবার ঐসব ঘাস পাতা বিছাতে হয়। এরকম করে যখন সব পাতা শেষ হয়ে যায় তখন সবের উপরে এবং পাশে একপর্দ্দা গোবর দিয়ে বেশ করে ঢেকে দিয়ে রেখে দিতে হয়। কখনও কখনও এর মাঝে মাঝে অল্প অল্প চূণ ছড়িয়ে দেবার দরকার হয়। রোদ-বৃষ্টিতে ক্রমশঃ ক্রমশঃ মাটীর মতো ঝুর ঝুরে হয়ে গিয়ে সেটা খুব উৎকৃষ্ট সার হয়ে দাঁড়ায়। এর ক্ষমতা গোবরের চেয়ে অনেক বেশী। এ সারটা চাষীদের খুব সহজলভ্য বলেই মনে হয়।

দ্বিতীয় সারটা অতোটা সহজে না পাওয়া গেলেও সহজলভ্য বটে। কতকগুলি গাছ আছে যেমন অড়হর বা ধঞ্চে,—সেগুলোর ডালে পাতায় যথেষ্ট নাইট্রোজেন থাকে। এখন যদি সেগুলো একটু বড় হবার পর সেটাকে লাঙল দিয়ে চষে সেগুলোকে মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তা'হলে জমিতে খুব ভাল সার হয়। আর এ সারের মজা হচ্ছে যে এর পর যে কোন ফসল দেওয়া যাক না কেন, সে ফসল খুব ভাল হবে। বাংলায় এই সবুজ সার এখন কিছু কিছু চলেছে।

আর জমি উর্ব্বরা করার জন্য সারের মতোই আর একটা উপায় আছে, সেটা হচ্ছে মাঝে মাঝে দুই এক বছরের জন্যে

ফেলে রাখা। অনবরতঃ শস্য উৎপাদন কর্‌তে কর্‌তে জমি যদি দুই এক বছর বিশ্রাম পায়, তা'হলে তার উর্ব্বরতা খানিকটা ফিরে আসে। কিন্তু আমাদের দেশে লোকসংখ্যার তুলনায় জমি এতো কম যে এতে আমাদের অনেক অসুবিধা হয়ে পড়ে।

এক সময়ে চীনদেশেও ঠিক এই সমস্যা দেখা দিয়েছিল। সেখানেও জমির তুলনায় লোকসংখ্যা বেশী হওয়ায় জমি ফেলে রাখা সম্ভব হত না। কিন্তু সেইখানে একটা খুব সুন্দর উপায় বার হয়েছে। সেখানে বৈজ্ঞানিকেরা ভেবে ভেবে বার করেছেন কোন শস্যে জমি হতে কি কি জিনিষ খায়। তারপর তাঁরা জমিতে দেবার জন্য আটটা ফসল ঠিক করলেন। সেই ফসল গুলি এমন ভাবে সাজান যে প্রথম ফসল যে জিনিষটা খায় আর কোন ফসল সে জিনিষটা খায় না, আর দ্বিতীয় ফসল যে জিনিষটা খায় আর কোনও ফসল সে জিনিষ খায় না। সেইজন্য দেখা যায় যে প্রথম ফসলটা যে জিনিষ খেয়ে নেবে, সে জিনিষটা আর সাতটা ফসল না খাওয়ায় সঞ্চিত হতে থাকবে আর সাতটা ফসলের পর যখন আবার সেই প্রথম ফসলটা ফিরে আস্‌বে তখন জমিতে তার জন্যে যথেষ্ট খাদ্য জমে যাবে। আবার দ্বিতীয় ফসলের বেলাতেও তেমনি। এই রকমে দেখা গেছে যে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। আর সেই জন্য চীনে এই ব্যবস্থা চল্‌তে আরম্ভ হয়েছে।

এর বিরুদ্ধে যতোই কিছু যুক্তি থাকে না কেন, জমি না ফেলে রেখে যদি ফেলে রাখার কাজ পাওয়া যায় তা হলে আমাদের যথেষ্ট সুবিধা। কাজেই আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকেরা যদি এইরকম একটা ফসলের চক্র ঠিক করে দেন তা হলে চাষীরা সেইমতে চলে অনেক উপকার পেতে পারে।

চাষীরা যে চাষ হতে বেশী লাভ পায় না তার আর একটা কারণ হচ্ছে যে তারা ভাল বীজ দেয়না, বা ভাল জাতের ফসল লাগায় না। তারা যে ধরণের ফসল লাগায় তার ফলন খুব অল্প। এই জন্যে তাদের পরিশ্রম ও টাকা বহু পরিমাণে নষ্ট হয়। তারা যে টাকা খরচ করে আর যে পরিমাণ পরিশ্রম করে তাতে আরও অনেক বেশী ফসল হতে পারে। যেমন ঢাকায় গভর্ণমেণ্টের যে ফার্ম আছে, সেখানে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে কয়েকটা জাতের ধান সামান্য পরিশ্রমে ও সমান খরচে অন্যান্য জাতের ধানের চেয়ে বেশী ফলে। নীচে বিভিন্ন জাতের ধান একর প্রতি কত ফলে তার একটা হিসেব দিচ্ছি।

	ইন্দ্রশালী (ফার্মের ধান)	স্থানীয় আমন	কটক-তারা	স্থানীয় আউস
রাজসাহী	২০৶৬	১৯৷৷৫	১৬৶২	১৫।৬
রংপুর	১৮/০	১৫/১	১৬/৫	১৩।৫
দিনাজপুর	২৭৷৷৬	২২/০	২১/৭	১৭/৫
চুঁচড়া	৩২৶৭	২৮৶৪	—	—

এই হতে দেখা যায় যে ইন্দ্রশলি বা ইন্দ্রশাইল ধান অন্যান্য সাধারণ ধান অপেক্ষা কতো বেশী ফলে। এইরকম আরও কয়েকটী ধান বেশী ফল্‌তে দেখা যায়। ঢাকা ফার্ম্মে ঝিঙ্গাশাইল নামে আর একটা ধান আছে সেটা ইন্দ্রশালের চেয়েও একমন করে বেশী ফলে। আবার লাটিশাইল বলে আর একটা ধান রয়েছে সেটা খুব তাড়াতড়ি পাকে বলে দোফসলি জমিতে দুটা ফসলের জন্যই এই ধান ব্যবহার করা চলে। এ ছাড়া সরকরের কৃষিবিভাগ থেকে আর একরকম সরু আউস ধান অবিষ্কৃত হয়েছে। এর নাম হচ্ছে চার্ণক প্যাডি; জ্যৈষ্ঠের ২৫শে নাগাইদ লগালে আশ্বিনের প্রথমেই বিঘা প্রতি ৮। ৯ মন খুব সরু চাল পাওয়া যায়। এর উপকারিতা হচ্ছে যে জল বেশী না হলেও এ ধান ভাল ফলবে। এমন কি বিহারের যেখানে উলুঘাস ছাড়া কিছু হয় না, সেখানেও এ ধান ফল্‌তে দেখা গিয়াছে। ঢাকা ও বর্দ্ধমান ফার্মে এর বীজ পাওয়া যায়। আবার পাটের বা আখের বেলাতেও দেখা যায় যে ফার্ম্মের পাট বা আখের ফলন বেশী। নীচের হিসেব হতে এটা সুস্পষ্ট হবে—(একর প্রতি)

	ফার্মের পাট	স্থানীয় পাট	ফার্মের আখ	স্থানীয় আখ
রাজসাহী	২২/৬	১৭৸৪	৬১।১	৩৭৸৮
রংপুর	২৩/০	১৮৷৬	৫৭॥০	৩৬/০

দিনাজপুর	২১।২	১৭৸৪	—	—
চুঁচড়া	২৯।০	১৮/০	৯১৸৫	৫৮৸৫

কিন্তু আমাদের দেশে এখনও এসব ধান, পাট বা আখ বেশী চলেনি। এইসব ধান বা পাট যদি প্রচুর চলতে আরম্ভ করে তা'হলে আমাদের চাষীদের আয় নিঃসন্দেহ বাড়বে। যদি সমবায় সমিতির সভ্যেরা বাংলার প্রত্যেক জেলায় বেশী ফলে এই রকম ধান বা পাট যদি কিছু কিছু করে বিতরণ করেন তবে বোধ হয় নিশ্চয়ই পরের বছর সে ধানের জন্যে যথেষ্ট আগ্রহ হবে। জমিদার বা অন্য উপযুক্ত লোকেরও এসব ধানের বীজ যাতে বিতরিত হয় সে সব দিকে একটু লক্ষ্য রাখা উচিত।

চাষীর কম আয়ের আর একটা কারণ হচ্ছে ভাগে চাষ। যেখানে চাষীর জমি কিছু বেশী সেই খানেই অনেক সময় চাষী ভাগে চাষের বন্দোবস্ত করে। কোনখানে দশআনা ছয়আনা কোনখানে বার আনা চার আনা আবার কোথাও কোথাও বা আট আনা আটআনা ভাগের বন্দোবস্ত হয়। অবশ্য এ প্রণালীটা অনেক সময়ই খুব কার্য্যকরী। আর এখন বাংলার চাষবাসের যা অবস্থা তাতে এটা না হলে হয়তো অনেক জায়গাতেই যে চাষ হচ্ছে, সেইটেই ওঠা সম্ভব হত না। কিন্তু আমরা যখন আরও উন্নত প্রণালীতে চাষবাসের কথা আলোচনা করছি তখন এ ধরণের ভাগে চাষ আমাদের চাষীর আদর্শ হওয়া উচিত নয়।

এই ভাগে চাষের ফলে কতকগুলি জিনিষ দেখা

দিচ্ছে যা খুব আদর্শ স্থানীয় নয়। প্রথমতঃ যে চাষী ভাগে জমি দিচ্ছে তার দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে দেখতে পাওয়া যায় যে এতে তার আয় বেশ কমে যাচ্ছে। তার নিজের অধীনে লোক রেখে যদি সে কাজ করতে পারে তা হলে সে তার নিজের উৎসাহে জমিতে সেচ, সার প্রভৃতির বন্দোবস্ত করতে পারে। কিন্তু ভাগে চাষ হলে না সে নিজে জমির উন্নতির ব্যবস্থা করবে না সেই ভাগের চাষী জমির উন্নতির জন্যে চেষ্টা করবে; মাঝ থেকে জমির শস্যোৎপাদনের ক্ষমতা যাবে কমে; আর কিছু দিন বাদে কম লাভজনক সর্ত্তে ভাগজোতে সে জমি বিলি করতে হবে। এইরকমে ক্রমশঃ ক্রমশঃ সে চাষীর জমি হতে তার ক্ষতি হতে সুরু হবে।

আবার যে ভাগজোতে জমি নেবে তার দিক্ দিয়ে দেখতে গেলেও কতকগুলি জিনিষ দেখা দিচ্ছে, যা তার পক্ষেও যে খুব সুবিধের তা নয়। এতে তাকে সারা বছরটা পরিশ্রম করতে হয়, কিন্তু এতে তার যে লাভ হয়, তা আমাদের গরীবে দেশ বলে কোন রকমে চলে গেলেও অন্যান্য দেশের তুলনায় সে লাভ অত্যন্ত সামান্য লাভ। আর তা ছাড়াও এ জিনিষটার একটা মানসিক প্রভাব রয়েছে যেটা আমাদের দেশের উন্নতির পথে খানিকটা বাধা দেয় বলে মনে হয়। চাষী ঐ সামান্য লোভেই ভাগজোতে কারবার করে, আর অন্য কোন দিকে যায় না। কিন্তু যদি ভাগে চাষ না থাকতো তা হলে হয় তারা জমির অধিকারী চাষীর

অধীনে কাজ করে এর চেয়ে লাভবান হতো বা অন্যান্য ব্যবসায়ে ঢুকে বহুলাভ পেতে পারতো। কিন্তু যুগ-যুগান্তরের এই অল্প-লাভের চাষ তাদের যেন টেনে আনে।

ভাগজোতের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে এতে জমির মালিক কেবল লাভ নিতেই থাকে কিন্তু জমির উন্নতির জন্য কোন খরচ কর্‌তে চায় না। যদি এমন কোন ব্যবস্থা হয় যে জমির মালিককে জমির উন্নতির চেষ্টার জন্য কিছু খরচ কর্‌তে বাধ্য হ'তে হয় তা'হলে কি জমির মালিকের, কি চাষীর সকলেরই অসুবিধা দূর হয়ে যায়। ইটালী ও বিলেতেও ভাগে চাষের ব্যবস্থা যে নেই তা নয়। কিন্তু সেখানে এই রকম ব্যবস্থা হওয়ায় ভাগে চাষের অপকারিতা প্রবল হয়ে ওঠে না।

আমাদের এইসব নূতন ধরণের চাষবাস কর্‌তে গেলে একদল সবল সুস্থ চাষী গড়ে ওঠা দরকার হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন—

চাই বল, চাই স্বাস্থ্য আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট—

সে রকম চাষীরদলই আমাদের চাই আর তা পেতে হলে এক সরকারী কমিটী যা বলেছেন সে কথাগুলো মনে রাখা দরকার যে চাষীর উন্নতির জন্যে সবচেয়ে বেশী দরকারী হচ্ছে তার অন্তরের প্রেরণা আর তার পরেই তার পারিপার্শ্বিকের উন্নতি। এখন জ্ঞান ও শিক্ষা তাদের হৃদয়ে জাগিয়ে তুলবে সেই

দীপ্ত প্রেরণা আর সেই জ্ঞান ও শিক্ষার সঙ্গে সম্মিলিত চেষ্টা মিলে হবে পারিপার্শ্বিকের উন্নতি। শেষ অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হবে।

আমাদের চাষীর আদর্শ হচ্ছে জাপান, আমেরিকা নয়। তাই জাপানে যেমন করে চাষীদের উন্নতি হয়েছে, এদেশেও কতকটা সেই উপায়ই চলবে। কবে আমরা দেখতে পাব যে চাষী একধারে সে সব উন্নত যন্ত্রপাতি চালাচ্ছে—বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার পরীক্ষা করে করে নানারকম ফসল বাড়াচ্ছে দেশ বিদেশে সেগুলো চালান হচ্ছে চাষ ছাড়াও কুটীর শিল্প বা ব্যবসায় থেকে তার যথেষ্ট আয় রয়েছে আর অন্যদিকে জ্ঞান ভাণ্ডারের সন্ধান তারা পেয়েছে ; কি আর্ট, কি বিজ্ঞান, কি চাষবাস কি ব্যবসায় সব বিষয়ে যেন তারা ঠেলে উঠছে !

বাংলাতেও চাষীর ভাগ্যে মোড় ফিরেছে। আমাদের বলতে ইচ্ছা করে, আশা করতে ইচ্ছা করে—আসিবে সেদিন আসিবে।

২। বিভিন্ন জেলার সমস্যা।

উপরে যে সমস্ত সমস্যার কথা আলোচনা করা হল, সে সব সমস্যা প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই সমানভাবে দেখা দিয়েছে। বাংলার প্রত্যেক জেলাতেই হাল লাঙল অনুন্নত, গরু দুর্ব্বল আর চাষে ফলন অত্যন্ত কম। কাজেই এসব সমস্যার সমাধানের উপায়ে প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই এক রকম।

কিন্তু এ ছাড়াও চাষের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধযুক্ত এমন কতক

গুলো সমস্যা আছে যা বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। এ সম্বন্ধে সব চেয়ে বড়ো সমস্যা হচ্ছে কোন জেলায় কতোটা কি ফসল চাষ হচ্ছে আর বাজারের অবস্থা বুঝে, ও জেলার নিজের অবস্থা বুঝে সে ফসলটা কতোটা চাষ হওয়া উচিত ছিল আর অন্যান্য ফসল কি কি চাষ হওয়া উচিত ছিল—এরই সমস্যা। এ সম্বন্ধে একটা সাধারণ নিয়মে চল্‌তে পারে না কারণ বাংলার সব জেলায় এক ফসল চাষ হওয়া সম্ভব নয়। পূর্ব্ববঙ্গে যেমন প্রচুর পাট ফল্‌বে, পশ্চিমবঙ্গে রাণীগঞ্জের কাছে সে রকম পাট হওয়া তো দূরের কথা পাট হবে কি না সেইটেই সন্দেহের বিষয়। কাজেই এ সম্বন্ধে প্রত্যেক জেলা আলাদাভাবে ধরে ধরে আলোচনা করা দরকার। দুর্ভাগ্যের বিষয় এখনো প্রত্যেক জেলার সমস্ত খবর পাওয়া যায় না, যতটুকু পাওয়া গিয়েছে ততটুকু নিয়েই আমাদের আলোচনা করতে হবে।

বাংলা একটা প্রকাণ্ড দেশ। এর মধ্যে নানারকম প্রাকৃ-তিক বৈচিত্র্য রয়েছে। উত্তুঙ্গ নগাধিরাজ হতে আরম্ভ করে জলাজমি পর্য্যন্ত সবই এখানে রয়েছে। তাই মোটামুটী মিল দেখে আমরা বাংলাদেশকে চার কি পাঁচ ভাগে ভাগ করে নেব।

প্রথমতঃ পশ্চিমবাংলা বা বিহারের সীমানার বাংলা। এ বল্‌তে আমরা বাঁকুড়া বর্দ্ধমান হতে আরম্ভ করে মালদহ পর্য্যন্ত বুঝব।

তারপর উত্তরবাংলা বল্‌তে আমরা ময়মনসিংহের কিছু অংশ সমেত প্রধানতঃ রাজসাহী বিভাগটাকেই বুঝব।

তারপর পূর্ব্ববঙ্গ। এতে আমরা ত্রিপুরার পূর্ব্বাংশ ছাড়া ও বাখরগঞ্জ নোয়াখালির দক্ষিনাংশ ছাড়া ঢাকা বিভাগটাকে বুঝব।

দক্ষিণবাংলা বল্‌তে আমরা সমুদ্রের ধার দিয়ে যেমন চব্বিশ পরগণার ও খুলনার সুন্দরবন প্রভৃতি এবং বরিশাল বা মেঘনার জলে ডোবা ফরিদপুরের অংশগুলি বুঝব।

আর এছাড়াও বাংলার আর একটা ধরণের জেলা রয়েছে যেখানে পার্ব্বত্য সমস্যাগুলি পূর্ণমাত্রায় দেখা দিয়েছে। এটা হচ্ছে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম।

এখন সব জায়গায় প্রত্যেক জেলা ধরে সম্ভব না হলেও এই কটা বিভাগের যতটুকু পারা যায় খুঁটানাটিভাবে আলোচনা করা যাক্। প্রথমেই আমরা দক্ষিণবাংলার চব্বিশ পরগণা হতেই আরম্ভ করব, কারণ সেইখানেই বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগর অবস্থিত।

চব্বিশ পরগণা জেলার মাটীর উৎপাদিকা শক্তি সাধারণতঃ যথেষ্ট আছে। এর পশ্চিম দিক দিয়ে গঙ্গা ব'য়ে গিয়েছেন—মধ্যে দিয়ে ছোট-বড় আরও অনেক নদী রয়েছে। তার মধ্যে মাৎলা আর বিদ্যাধরীই প্রধান। এ ছাড়া ছোটো বড়ো খালও রয়েছে বিস্তর। খালটা চব্বিশ পরগণায় বেশ আছে। আর

এছাড়া বেশ কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বিলও রয়েছে। তার মধ্যে কুলগাছির বিল, বেরিলি বিল, দাঁতভাঙ্গা বিল, স্বরূপ-নগরের বিল এই কয়টী বিলই প্রধান। বিল ক'টী সাধারণতঃ জেলার পূর্ব্বদিকেই বেশী দেখা যায়। খুলনার দিকে যেখানে জলা-জায়গা বেশী রয়েছে—সেইখানেই এই বিলগুলি হয়েছে। এ হতে বোঝা যায় যে চব্বিশ পরগণার জমি ক্রমশঃ পশ্চিম দিক হ'তে পূবদিকে ঢালু হয়ে গেছে। আর জলাজায়গা বলে পূবদিকে ছোট ছোট নদীরও বাহুল্য।

চব্বিশ পরগণায় নানা রকম জমি রয়েছে। তার মধ্যে ধানের জমিই সবচেয়ে বেশী। চব্বিশ পরগণায় মোট ধান হয় ৯০৬,৬০০ একরে, গম, যব, জোয়ার, বজরা, ভুট্টা আর অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য হয় ৯২৯১০০ একরে, তিল, সর্ষে, রেড়ি হয় ৩২০০ একরে, মসলা হয় ৩৩০০ একরে, আখ, ও চিনি হয় এমন ফসল যেমন বিট ইত্যাদি হয় ৫১০০ একরে, পাট আর অন্যান্য সুতোওয়ালা জিনিষ হয়, ৬৪,৫০০ একরে। চা, তামাক সিন্‌কোনা, শন প্রভৃতি হয় ১০০০ একরে। গরুর খাবার হয় ১০০০ একরে। ফল ও তরিতরকারী হয় ১১৮০০ একরে। আর অন্যান্য কিছু কিছু জিনিষ বাকী ৫০০০ একরে। এখন এই হতে দেখা যায় যে চব্বিশ পরগণায় ধান হয় সব চেয়ে বেশী। তার পরেই পাট (৬৪৫০০)। এখন বাজারে ধান ও পাট উভয়েরই দর পড়ে যাওয়ায় চাষীদের দুর্দ্দশা হয়েছে। তারা না পায়

পাটে দাম, না পায় ধানে দাম। ১৯৩৫ সালে ধানের মণ গিয়েছে ৪৲ করে, আর পাটের দাম গিয়েছে ৩৷৹ টাকা করে। এই হতেই বোঝা যায় যে চাষীদের দুর্দ্দশার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

কাজেই চাষীদের উন্নতি কর্‌তে গেলে চব্বিশ পরগণার ধান ও পাটের চাষ কমাতে হবে। সরকার হতে ঠিক হয়েছে যে পাটের চাষ এখন যা আছে তার চেয়ে সারা বাংলাতেই পাঁচ আনা কমান দরকার। কাজেই পাটের চাষ চব্বিশপরগণায় ৪০০০০ একরের বেশী জমিতে হওয়া উচিত নয়। বাকী যে কুড়ি হাজার একর জমি এতে অন্য নানারকম ফসল লাগান উচিত। তার মধ্যে একটা হচ্ছে আখ। যে বৎসর ধানের মণ গিয়েছে ৩৷৹ করে, সেই বছরেই গুড়ের মণ গিয়েছে ৬৲ টাকা করে। এ হতে বুঝা যায় যে চাষী যদি বেশী করে আখের চাষ কর্‌তে পারে, তা হলে চালের বা ধানের দামও চড়বে, আর তারা গুড়ের দামেও বেশ লাভবান্ হবে—এক সঙ্গে দুদিকেই উন্নতি হবে। আখের মধ্যে চব্বিশ পরগণার জমিতে কইম্বাটোর ভাল ফল্‌তে পারে। কাজেই বেশী জাভা আখ না লাগিয়ে চাষীদের উচিত হচ্ছে বেশী করে কইম্বাটোর ও কাজুলী আখ লাগান। এতে রস পাওয়া যায় খুব বেশী পরিমাণে, সেইজন্য চাষীর লাভের সম্ভাবনা বেশী।

চব্বিশ পরগণায় তুলোর চাষ হয় না। অথচ নদীয়ায় যথেষ্ট তুলোর চাষ হয়। চব্বিশ পরগণায় জমি তুলোর পক্ষে

খুব ভাল না হলেও তুলো যে একেবারে হতে পারে না এমন নয়। নদীয়ায় ১৯৩৫ সালে তুলোর মণ ছিল ২০৲ টাকা করে। কাজেই যদিও বড়ো বড়ো তুলো ক্ষেত করা সম্ভব না হয়, তবুও চাষী যদি ধান চাষের সঙ্গে সঙ্গে আনুসঙ্গিক ভাবে তার বাড়ীর আশ পাশ দিয়ে তুলোর চাষ করে, তাহলে বোধ হয় সে কিছু লাভ করতে পারে। আমার মনে হয় এবং সরকারী মতও তাই সে একেবারে উত্তর চব্বিশপরগণায় তুলোর চাষ কিছু কিছু পরিমাণে হওয়া সম্ভব। এ সম্বন্ধে উত্তর চব্বিশ পরগণার চাষীদের চেষ্টা করা উচিত।

এ ছাড়া আর একটা জিনিষ চব্বিশ পরগণার অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে চাষ হতে পারে। সেটা হচ্ছে চিনাবাদাম। চিনা-বাদাম কল্‌কাতায় যথেষ্ট দরে বিক্রি হয় আর এ অনেক রকম কাজে লাগে। এমন কি দুই একজন বিশেষজ্ঞ,—যেমন বিপিন বিহারী ব্রহ্মচারী বলেছেন যে সত্য সত্য যদি চিনেবাদাম হ'তে তেল করে সেই তেল রান্নার জন্য ব্যবহার করা যায় তবে সে তেল পুরাণো ঘিয়ের চেয়ে কোনও অংশে খারাপ নয়। বাজারে এখনও চিনেবাদামের দাম রয়েছে। চব্বিশ পরগণায় চিনে-বাদামের চাষের চেষ্টা হওয়া উচিত।

চব্বিশপরগণার যে কোন যায়গাই কলকাতা হতে বেশী দূর নয় বলে এখানে একটা মস্ত সুবিধা রয়েছে। এখানে যদি সম্মিলিত ভাবে তরিতরকারীর চাষ ও ফল বাগানের চাষ

হয়, তাহলে চব্বিশপরগণার চাষীর যথেষ্ট আয় হতে পারে। যাতে জিনিষগুলি ন্যায্য দামে বিক্রি হতে পারে সে জন্য সমবায় বিক্রয় সমিতি থাকা দরকার। তা'হলে আমরা কল্‌কাতার মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে ফল কিনে যে টাকাটা দিল্লীর লোকদের দি' সেই টাকাটা অনেক পরিমাণে চব্বিশপরগণার চাষীরা পাবে। এই জিনিষটার প্রতি আমাদের খুব বেশী দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এই গেল চব্বিশ পরগণা সম্বন্ধে মোটামুটী কথা।

তারপরে খুলনা। চব্বিশ পরগণার চেয়ে আকারে বড় নয়, প্রায় সমান। কিন্তু তা হলেও খুলনার সমস্যা আর চব্বিশ পরগণার সমস্যা এক নয়। চব্বিশপরগণার চেয়ে খুলনা অনেক বেশী জলা। প্রচুর খাল বিল আর ছোটো ছোটো নদীতে পরিপূর্ণ। নদীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নদী হচ্ছে হরিণঘাটা, যমুনা বা কালিন্দী, ভৈরব আর মধুমতী বা গড়ুই। বিল গুলোর মধ্যে পাবলা বিল আর বাগ্‌ড়া বিল আর ডাকাতে বিল। এই কটা বিলই বড়ো, এছাড়া খুলনায় আরো বহু বিল ও জলা জমি রয়েছে। সেই জন্য খুলনার সমস্যা হচ্ছে জলা জায়গার সমস্যা।

খুলনা জেলাতে ধান হয় ১০,১০,৯০০ একরে, গম, যব প্রভৃতি হয় ১০,২২,০০০ একরে, রেড়ি সর্ষে, তিল প্রভৃতি হয় ২৬৮০০ একরে [তার মধ্যে সর্ষে ১৫৩০০], মসলা—৮৫০০ একরে, আখ ৫০০ একরে, পাট ২৩,৪০০ একর, চা তামাক

প্রভৃতি ঔষধ ৪৮০০ একর, আর অন্যান্য কিছু কিছু হয় হাজার পনের একরে। খুলনাতে এরকম সমস্যা রয়েছে যে এ সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন, তবে কেবল পাট চাষ না করিয়া কিছু শন আর তা ছাড়া নানা রকম মশলা যথা ধঞে, হলুদ, আদা এসব চাষের চেষ্টা করা উচিত। এ জেলাতে বড়ো বড়ো জলা বা খাল থাকাতে এদেশে মাছের ব্যবসা ভাল চল্‌তে পারে বলে মনে হয়।

দক্ষিণ বাংলা বল্‌তে খুলনা ছাড়াও বরিশাল পর্য্যন্ত বোঝায়। এসব জায়গাও অনেকটা খুলনারই মতো। বাখরগঞ্জ জেলার পূর্ব্ব ধার দিয়েই প্রসিদ্ধ মেঘনা নদী এসে সমুদ্রে পড়েছে। আর এর একটু উত্তরেই ফরিদপুর যশোরের দক্ষিনাংশ—এসব জেলা প্রায়ই জলা। এখানে এখন বাখরগঞ্জে ১৬১৪৪০০ একর জমি ধান, আর ৪৬৬০০ একর পাট হচ্ছে। অন্যান্য জিনিষও কিছু কিছু রয়েছে। ফরিদপুরেই পাট খুব বেশী, এখানে ২১১,৭০০ একর জমিতে পাট হয়, ধান হয় ১১২২,২০০ একর জমিতে। এখানে কেবল মাত্র আর একটা জিনিষ হওয়া সম্ভব সেটা হচ্ছে আখ, আর তা ছাড়া ফরিদপুর জেলায় শন চাষ প্রায় হয় না। কিন্তু ফরিদপুরের মাটী শনের জন্য ভাল। পাটের সঙ্গে সঙ্গে শন চাষ করা দরকার।

এ ছাড়া দক্ষিণ বাংলার দক্ষিণে সমুদ্রের ধার দিয়ে কেবল মাত্র ধান চাষ ছাড়া কোনও উপায় নেই। সুন্দরবনে স্যার

ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের জমিদারিতে এখন খুব ভাল ধান চাষ হয়। ধান ছাড়া এখানে নারিকেল হওয়ার খুব সম্ভব। বিনা কষ্টে নারকেলে যা লাভ হয় সেটা নেহাৎ কম নয়। কাজেই কোন নদীর বাঁধের উপর দিয়ে বা অন্য কোথাও যদি অনেক নারকেল গাছ লাগান হয়, তা হলে তার আয়ে চাষী মন্দ লাভ-বান হবে না। মেদিনীপুরে যেখানে ভয়ানক নোনা, সেখানে তো নারকেল গাছ খুব ভালই হতে পারে। এই গেল মোটা-মুটীভাবে দক্ষিণ বাংলার কথা। তারপরেই এসে পড়ে পূর্ব্ববঙ্গের সমস্যা। এই পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে ফরিদপুরের উত্তরাংশ, ঢাকা, পাবনার পশ্চিমাংশ, ময়মনসিংহ, প্রধানতঃ এই ক'টী জেলা পড়ে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো জেলা হচ্ছে ময়মনসিংহ।

ময়মনসিংহের বুকের উপর দিয়েই বিখ্যাত ব্রহ্মপুত্র নদ বয়ে চলেছে। আর ময়মনসিংহেরি পূর্ব্বদক্ষিণকোণে বাংলার মাতৃ-স্বরূপা পদ্মা আর ব্রহ্মপুত্র মিলিত হয়েছেন। এইজন্যে ময়মন-সিংহের জমির উর্ব্বরতা বেশী। মাঝে মাঝে ব্রহ্মপুত্রের বানে অনেক পলিমাটী এসে জমিকে উর্ব্বরা করে দিয়ে যায়। কিন্তু ময়মনসিংহের পূর্ব্বাংশ এতো নদী-প্রধান না হওয়ায়, সেখানে জমি এতো উর্ব্বর নয়। বরং সে দিক্‌টা অনেক্‌টা অনুর্ব্বর বিহারী জমির ধরণের। ময়মনসিংহে ধান হয় প্রচুর—২,২৭৯,৩০০ একরে, পাট হয়—৫৩৭,৬০০ একরে, তুলো হয়—৪২০০ একরে। আখও ময়মনসিংহে মন্দ হয় না—১৬,৪০০ একর আখ চাষ

আছে। সর্ষেও প্রচুর হয়—২৬৯,৪০০ একর। আর একটা জিনিষ ময়মনসিংহে বেশ চাষ হয়—সেটা হচ্ছে তামাক ১১,৮০০ একর। গরুর খাবার হয় ৬৬৫০০ একর। ফল তরকারী হয়—৭১,১০০ একর। কাজেই দেখা যায় যে এই বিরাট জেলায় বহু জমি রয়েছে আর চাষের বহু সুযোগ সুবিধা রয়েছে।

সরকারী বিশেষজ্ঞদের মত হচ্ছে যে ময়মনসিংহ জেলায় এখন অন্ততঃ ১০০০০০ একর জমিতে পাট চাষ বন্ধ করা উচিত। পাট চাষ এত বেশী হয়েছে যে মাল যথেষ্ট জমে গিয়েছে, আর সেইজন্য কলওয়ালারা কম দামে চাষীদের কাছ হ'তে পাট কিন্‌ছে। সেইজন্যে চাষীদের উচিত হচ্ছে এখন কিছুদিন পাট চাষ কম করা। সেই হিসেবে ময়মনসিংহে এখন পাটের জমি ১ লক্ষ একর কম করে দেওয়া দরকার হয়েছে। সেখানে অন্যান্য ফসল চালাতে হবে—যেমন কাঁওন, চিনা, রেড়ি। আর তার সঙ্গে তরিতরকারীর চাষের উপরেও লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে। রেড়ীটা ময়মনসিংহে কম হয়—আরও হওয়া উচিত। আর রেড়ীর দর ৬৷০ পর্য্যন্ত মণ হয়। আর যে বছর ময়মনসিংহে (১৯৩৫) ধানের মণ হয়েছে ২॥০ করে—সেই বছরেই রেড়ীর দর গিয়েছে মণ পিছু ৩৷০ করে। কাজেই রেড়ীর দিকে ময়মনসিংহের চাষীর লক্ষ্য দেওয়া উচিত।

আর এখানে আরও দুটী জিনিষের উপর জোর দিতে হবে। এখানে তুলোর চাষ রয়েছে কিন্তু কম। এ জেলায় তুলোর

চাষ বাড়াতে হবে। তুলোয় লাভ প্রচুর। পূর্ব্বোক্ত বছরেই তুলোর মণ হয়েছিল ৮৲ থেকে ১০৲ টাকা। কাজেই এদিকে চাষীদের লক্ষ্য রাখা দরকার। আর এ জেলায় চিনাবাদাম হওয়ার সম্ভব রয়েছে। চিনাবাদামে যে বেশ লাভ থাকে তা পূর্ব্বেই বলেছি। কাজেই চিনা বাদামও যাতে হয় বিশেষতঃ ময়মনসিংহের পূর্ব্বাংশে—সে বিষয় চেষ্টা করা উচিত।

ঢাকা জেলাটাও উল্লেখযোগ্য ; আর এখানে যথেষ্ট উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। এ জেলার পশ্চিম ও দক্ষিণ দিয়ে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত পদ্মা বয়ে চলেছেন, আর ক্রমশঃ ক্রমশঃ বিপুল আকার ধারণ করে মেঘনা নাম নিয়ে সমুদ্রে পড়েছেন। আরও ছোট বড় নদী রয়েছে—সেইজন্যে ঢাকা জেলাতেও জলাজমির অভাব নেই।

ঢাকায় কি কি শস্য হয় তা আলোচনা করলে দেখা যাবে যে সেখানে ধান হয়—৯৫৫,৮০০ একরে, পাট হয়—২৫২,৯০০ একরে, আখ হয়—১৯০০০ একরে। তরিতরকারী অন্য সব জেলার চেয়ে বোধ করি এখানেই বেশী হয়—১০৫,৬০০ একর। সর্ষে হয় প্রচুর ৭২৫০০ একর ধরে। গরুর খাবার ঢাকাজেলায় ১৯৩৫ সালে হয়েছিল মোটে ২১০০ একরে কিন্তু সাধারণতঃ চাষ হয় ১৮০০০ একর ধরে। গরুর খাবার এতটা কমা বড় ভাল লক্ষণ নয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে ময়মসসিংহের মত এখানেও অন্ততঃ

১০০,০০০ একর জমিতে পাট চাষ বন্ধ করতে হবে। তার বদলে এখানে আখের উপর বেশী ঝোঁক দিতে হবে। আখ ঢাকায় ভাল হওয়ার সম্ভব। ঢাকা ফার্ম হতে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে ঢাকায় আখ ভালই হতে পারে। সেইজন্য ঢাকায় আখের চাষ বাড়ানোর চেষ্টা করা উচিত। ঢাকায় গুড়ের দর মন্দ নয়। ১৯৩৫ সালে চালের দর গেছে ৩/০ করে মণ। পাটের দর গেছে ৩৸৴০ করে। সেই বছর গুড়ের দাম গিয়েছে মণ পিছু ৪৲ টাকা করে। কাজেই আখ চাষে চাষীরা লাভবান্ হতে পার্‌বে—এ আশা করা যায়।

এছাড়া ঢাকায় শন খুব কম হয়। শণও বাড়ান দরকার। এছাড়া চিনাবাদাম ঢাকায় প্রচুর পরিমাণে হতে পারে। ঢাকায় রেড়ী হয় মোটে ৫,২০০ একর। এই জেলাতে রেড়ীর চাষ আরও বাড়ান দরকার। ১৯৩৫ সালে ঢাকায় রেড়ীর দর গিয়েছে ৫৲ টাকা করে। এছাড়াও ঢাকায় তুলোর চাষ একেবারে হয় না। কিন্তু ঢাকায় তুলো হবার জমি যে নেই তা নয়। তুলোর দর ধান বা পাটের চেয়ে অনেক বেশী। কাজেই ঢাকার চাষীর তুলো চাষের দিকে লক্ষ্য দেওয়া উচিত। এ ছাড়া ঢাকা হতে প্রচুর মাছ কল্‌কাতায় চালান আসে। চাষীরা যদি চাষের সঙ্গে সঙ্গে জলকরের দিকে মন দেয় তাহ'লে তাদের সহজেই অর্থাগম হ'তে পারে। ঢাকাতেও যে সব জিনিষের প্রচলন হতে পারে পাবনাতে ও ফরিদপুরের

উত্তরাংশেও সেই সব জিনিষেরই প্রচলন হ'তে পারে। কেবল পাবনা জেলাতে সরকার হ'তে রেড়ী চাষের জন্য দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। পূর্ব্ববঙ্গে এসব ছাড়াও মাছের চাষের দিকে একটু ঝোক দেওয়া দরকার।

এই গেল পূর্ব্ববঙ্গের সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা। তারপর এসে পড়ে উত্তরবঙ্গ। উত্তরবঙ্গে আমরা পূর্ব্ববঙ্গ হতে আর একটু অন্য ধরণের সমস্যা পাই। পূর্ব্ববঙ্গ যতটা জলে ডোবা, উত্তরবঙ্গ সে রকম নয়—বরং বেশ উঁচুই। এই উত্তরবঙ্গ বলতে আমরা রাজসাহী, বগুড়া, রংপুর, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, মালদহের উত্তর পশ্চিমাংস আর দার্জ্জিলিং বুঝবো।

এরমধ্যে রাজসাহীটাই প্রথমে উল্লেখযোগ্য। এর দক্ষিণ দিক দিয়ে পদ্মা বয়ে গিয়েছেন। তা'ছাড়া এ জেলায় বিশেষ কোনও উল্লেখযোগ্য নদী নেই। রাজসাহীতেই বিখ্যাত চলন বিল।

রাজসাহীতে কোন্ কোন্ ফসল কতো উৎপন্ন হয় জান্তে পারলেই এ জেলার জমির প্রকৃতি বুঝ্তে পারা যাবে। এখানে ধানই বেশী ১০০৪,৩০০ একরে, আর পাট হয় মোটে ৮৫৫০০ একর। তবু এর মধ্যেই আবার সরকার পক্ষ ৫০০০০ একর পাট চাষ কমাতে বলেন। রাজসাহীতে ৭৫০০ একর জমিতে আখ হয়—সর্ষে, রেড়ী প্রভৃতি হয় ৮০,২০০ একর জমিতে। গরুর খাবার হয় মোটে ৩০০ একর জমিতে।

রাজসাহীর প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে গরুর খাবার বাড়ান। পাট কমিয়ে যে ৫০০০০ একর জমি বাঁচবে, তাতেই গরুর খাবারের জন্য নেপিয়ার ঘাস, সয়াবিন, বর্সিম, লুসার্ণ প্রভৃতির চাষ করা দরকার। আর রাজসাহীর জমি না একেবারে জলা অথচ না একেবারে শুকনো—নেপিয়ার প্রভৃতির পক্ষে ভাল জমি বলে মনে হয়। আর গরুর খাবার ছাড়া এ জেলায় আখের চাষ আরো বাড়ানো যেতে পারে। রাজসাহীতে ১৯৩৫ সালে ধানের দর গিয়েছে ৩।৶০ করে কিন্তু গুড়ের দর গিয়েছে ৩৸৶০ করে। এখনো সেখানে ভাল করে আখ চাষ চলেনি যদি আর ও ভালভাবে কম খরচে গুড় তৈরী করা যায় তা হলে চাষী গুড়ে ধান হতে বেশী লাভ পাবে বলে মনে হয়।

দিনাজপুরেও ধান বেশী, পাট কম—ধান ১,১৬৭,৩০০ একর, আর পাট ৭০,২০০ একর, এখানে মসলা হয় ৬০০ একর। ফল ও তরকারী হয় সাধারণতঃ ২৬৪০০ একর। কিন্তু গেল বছর সেখানে হয়েছিল মোটে ৫৪০০ একর।

দিনাজপুরের মাটী ফল বা তরকারী হওয়ার খুব উপযোগী। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে ফল বা তরিতরকারীর চাষ কমে গিয়েছে এই হতেই বোঝা যায় যে ফলের চাষ করে চাষী বিশেষ লাভবান হচ্ছে না। এর প্রধান কারণ হচ্ছে যে ফল তরি-তরকারী ঠিক সময়ে ঠিক বাজারে গিয়ে পৌঁছতে পারছে না। এর প্রতিকার করতে হ'লে বিক্রয় সমবায় সমিতির দরকার।

বাগান হ'তে ফল ও তরকারী চাষীদের কাছ হ'তে ন্যায্য দামে কিনে নিয়ে সমবায় সমিতি সেই ফল তরকারী নিয়ে গিয়ে ঠিক মতো বাজারে ফেলে বিক্রি করবেন। এতে সমবায় সমিতিরও লাভ হবে, আর ওধারে চাষারাও বাঁচবে।

দিনাজপুর একটা বড়ো জেলা, সেখানে গরু-বাছুর বড় কম নেই। সরকারী রিপোর্টে জানা যায় যে সেখানে অন্ততঃ ১৩৭৯৪২১ গরু আছে। কিন্তু সেখানে গরুর খাবারের জন্য মোটে ১০০ একর জমি চাষ করা হয়, ১৯৩৫ সালে আবার তাও চষা হয়নি'। যেখানে গরুর খাবার উৎপন্ন হয়নি' মানে যে চাষা অন্য জেলা হ'তে খাবার আনিয়া তার গরুকে পেট ভরিয়ে খাইয়েছে—এটা সম্ভব নয়। তা'হলেই আমাদের বুঝতে হবে যে গরু ঠিকমতো খাবার পায়নি'। এ অবস্থা সত্যি সত্যি বড়ো শোচনীয়।

আমাদের এ কথাটা সর্ব্বদাই মনে রাখা দরকার যে আমরা কলে লাঙ্গল চালাই না, কেবল মাত্র টিনে বন্ধ দুধ খেয়েই জীবন ধারণ করিনা। সেইজন্য আমাদের চাষের উন্নতি করতে গেলে হালের গরুর উন্নতি দরকার, আমাদের চাষীদের উন্নতি করতে হলে দুধের গরুর উন্নতি দরকার। সেইজন্য গরুর খাবারের যদি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশেষ কোন আয় না হয়, অন্ততঃ পরোক্ষ ভাবেও অনেক আয় বাড়বে।

বিশেষজ্ঞেরা বলেছেন যে দিনাজপুরেও ৫০০০০ একর

জমিতে পাট চাষ বন্ধ হওয়া দরকার। সেই জমিতে নেপিয়ার, হাতিঘাস, সয়াবিন প্রভৃতি গরুর খাবার চাষ করা চল্‌তে পারে। আর দিনাজপুরে ফল বাগানটার উপরে বেশী ঝোঁক দেওয়া উচিত—তাতে চাষীরা লাভবান হবে।

বগুড়া, জলপাইগুড়ি, রংপুর, সম্বন্ধেও কম বেশী উপরকার কথাগুলিই খাটে। কিন্তু দার্জ্জিলিংএর সমস্যা অন্যরকম। এ জেলার মধ্য দিয়ে নগাধিরাজ তাঁর বিরাট্‌ বপু্‌ ছড়িয়ে রয়েছেন। আর তার পাদমূলেই হচ্ছে ঘন-বনে ভরা টেরাই অঞ্চল। কাজেই এখানে সাধারণ সমতলের মতো চাষ-বাস চলে না। এখানে ধান কিছু হয়—৬৪৩০০ একর। পাট হয় ২৫০০ একর, চা হয় ৬০০০০ একর, সিনকোনা হয় ৩০০০ একর। ফল ও তরকারী হয় ২০০০ একর। এখানে ধান বা পাটের দিকে দৃষ্টি দিবার দরকার নেই—এখানে যাতে চা চাষের উন্নতি হয়—সেই দিকেই বেশী খেয়াল রাখা দরকার। এখনও আসাম বাংলার দ্বিগুণ চা তৈরী করে। বাংলা যদি ক্রমশঃ ক্রমশঃ সবচেয়ে ভাল চা তৈয়ারী কর্‌তে পারে, তা হলে তা'হতে প্রচুর লাভ হওয়ার সম্ভব।

কিন্তু এখন যে রকম ভাবে চা চাষ দার্জ্জিলিংএ চল্‌ছে—তাতে চাষীরা সামান্য মজুরী পায় মাত্র। বিশেষ কিছু লাভ-বান হয় না। কিন্তু চাষীরা যদি মিলে মিশে—তা সে সমবায়ই হোক্‌, বা অন্য কিছুই হোক্‌—নিজেরা চা কোম্পানী স্থাপনা

করতে পারে তা হলে তারা লাভ পাবে। সে কোম্পানী যে বড় হতে হবে, তার কোন মানে নেই। সে কোম্পানী আকারে ছোটই হোক্ কিন্তু সংখ্যায় অনেক হোক্।

বাংলার কমলালেবু প্রভৃতি এখনও আসাম হতে আসে। কিন্তু এসব দার্জ্জিলিংএ হওয়া সম্ভব। সেইজন্যে দার্জ্জিলিংএ আরও বেশী করে কমলালেবু প্রভৃতি ফল ও আলু এবং অন্যান্য তরকারীর চাষের দরকার রয়েছে। আর এছাড়া যদি চাষীদের মধ্যেই কোন বুদ্ধিমান লোক চাষীদের নিয়ে ঠাণ্ডাদেশের ফল যেমন আঙ্গুর বা আপেল দার্জ্জিলিংএ যদি ভাল ভাবে ফলাতে আরম্ভ করেন, তা'হলে চাষীদের অনেক টাকা পাওয়ার সম্ভব।

এই গেল মোটামুটী উত্তর বাংলার কথা। এরপর আমরা পশ্চিম বাংলায় এসে আবার একটু অন্য ধরণের সমস্যা দেখ্‌তে পাই। সে যেন অনেকটা বিহারের মতো জমি। যা দুটো একটা নদী আছে—কেবলমাত্র বর্ষায় তার স্রোত হয়—আর অন্য সময় বালি পড়ে থাকে। জমি উঁচু আর উর্ব্বরতা অপেক্ষাকৃত কম। কাজেই এদিক্‌টা অনেকটা বিহারের মতো চাষবাস দরকার। আমরা পশ্চিম বাংলা বল্‌তে মেদিনী-পুরের উত্তরাংশ, বাঁকুড়া বর্দ্ধমান বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদীয়া হুগলি হাওড়া—এই ক'টা জেলাকেই বুঝ্‌বো।

এরমধ্যে বড়ো হচ্ছে বর্দ্ধমান আর বাঁকুড়া। বর্দ্ধমানের

দুপাশ দিয়ে দামোদর আর বরাকর বয়ে গিয়েছে। কিন্তু জল সেচের জন্যে যে এর কিছু সুবিধা আছে তা নয়। বর্ষাকাল ছাড়া এর জল এত কম থাকে যে তাতে কোন চাষবাসই চল্‌তে পারে না। তবে সম্প্রতি দামোদর ক্যানাল হয়েছে। তাতে বর্ষাকালে বা অন্য যে সময়ে দামোদরে জল আসে—সেই সময় জল নিয়ে ক্যানাল ভর্ত্তি করে রাখা হয়—সারা বছর এই জলে চাষবাস চলে। এতে অবশ্য অনেকটা উপকার হয়েছে। আবার অপকারও যে হয়নি তা নয়। এর ফলে দামোদরের বন্যা বন্ধ হয়েছে—আর প্রতিবছর দামোদরের যে অল্প অল্প বন্যা হয়ে জমিতে খুব ভাল পলিমাটী পড়্‌তো—সেই পলিমাটীও বন্ধ হয়েছে। তার ফলে বর্দ্ধমানের উর্ব্বরতা কমেছে। *

বর্দ্ধমানে ধান হয় ৮২৮৩০০ একর পাট হয় মোটে ৭৮০০ একর, কিন্তু আখ হয় ১১৬০০ একর। ফল ও তরকারির চাষ যাতে বৃদ্ধি পায় সেদিকে নজর দেওয়া উচিত। আর তা ছাড়া হাওড়া বর্দ্ধমান কর্ডলাইন হওয়ার পর বর্দ্ধমান জেলা হতে ফল তরকারি এনে কল্‌কাতায় বিক্রি করা অনেক সহজ-সাধ্য হয়েছে। বর্দ্ধমানে তুলোর চাষ কিছু হয় না। কিন্তু বর্দ্ধমানে তুলোর চাষ বেশ ভাল রকমই হতে পারে। আর বর্দ্ধমানে যদি তুলোর চাষ হয়, তবে বর্দ্ধমানের চাষীরা প্রচুর পরিমাণে লাভবান্ হবে। বর্দ্ধমানের পাশে নদীয়ায়

* আচার্য্য রায় স্মৃতিগ্রন্থে ডাঃ মেঘনাদ সাহার প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

২০৲ টাকা করে তুলোর মণ, আর মেদিনীপুরে ৩৬৲ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রি হয়েছে। কাজেই বর্দ্ধমানে তুলোর চাষের দিকে ঝোঁক দেওয়া উচিত। তা ছাড়া এখানে কখনও পরীক্ষা করে দেখা হয়নি বটে, কিন্তু বোধহয় পরীক্ষা কর্‌লে দেখা যাবে যে রাণীগঞ্জ আসানসোল অঞ্চলে গালাপোকার চাষ হ'তে পারে। আর গালাপোকার চাষে যে কি রকম বেশী লাভ, তা বোধহয় সকলেই জানেন। বর্দ্ধমানের কথা বল্‌বার সময় আমাদের আর একটা কথা বলা উচিত। রাণীগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে ফুলের চাষ বেশ ভালভাবে হ'তে পারে বলে মনে হয়। কল্‌কাতায় প্রত্যেক দিন মিউনিসিপাল মার্কেটে যে কত টাকার ফুল বিক্রি হয়, তা শুন্‌লে আমাদের স্তম্ভিত হ'তে হয়। রাণীগঞ্জ ও বর্দ্ধমানের কাছাকাছি যদি বাঙালী নার্শারী হয়, তা হ'লে বোধ হয় সে নার্শারী বেশ ভালরকমই চল্‌তে পারে ও বেশ লাভবান্ হ'তে পারে।

বাঁকুড়াতে ধান হয় ৭১৮,৭০০ একর, ফল তরকারী হয় ১৩৩০০ একর, আখ হয় ৩১০০ একর, তুলো হয় ১৬০০ একর। এখানে তুলোর চাষে বেশ লাভ আছে। এখানে যদি আর তুলোর চাষ করা হয়—তা'হলে বোধহয় চাষীদের অর্থাগম হতে পারে। আর তা ছাড়া এখানে গম চাষ যা হয় তার চেয়ে আরও কিছু বেশী হতে পারে। ভুট্টা এবং ডাল এখানে বেশ হয়—আরও হওয়ার সম্ভব রয়েছে। চিনাবাদামও এখানে ভাল ফলতে পারে।

নদীয়া জেলা, বাঁকুড়া বা বৰ্দ্ধমানের পশ্চিমাংশের মতো অতোটা শুকনো নীরস নয়। এর উত্তরদিক দিয়ে পদ্মা বয়ে গিয়েছেন, পশ্চিমদিক দিয়ে বয়ে গিয়েছেন গঙ্গা। এই দুই মহানদীর মাঝে নদীয়া বাংলার সৃষ্টির চরম নিদর্শন ক্ষেত্র। এখানে ধান হয় ১,০৩৯,৮০০ একরে, পাট হয় ৬৭৬০০ একরে, ৭৬৮০০ একরে ছোলা হয়, ফল তরকারী হয় ১৮০০০ একরে, আখ হয় ১০০০০ একর। বিশেষজ্ঞদের মতে এ জেলাতে ৩০০০০ একর জমিতে পাট চাষ বন্ধ করা যায়। তার বদলে এখানে ফলচাষের দিকে ঝোঁক দেওয়া উচিত। কৃষ্ণনগরের কাছে সরকার পক্ষ হ'তে একটা ফলবাগান করা হয়েছে। সরকারের অবশ্য অনেক খরচ হবে—তবু এ রকম চেষ্টার ফল হতে মনে হয় যে এতে চাষীরা বেশ লাভবান হতে পারবে।

নদীয়া জেলার মধ্যে কৃষ্ণনগরের দিক্‌টা বেশ উঁচু। সেদিকে বেশ রকমারি ফসল চাষ চল্‌তে পারে। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে আখ। এখানে আখ বেশ ভাল হতে পারে। সেইজন্য কেবল ১০০০ একরেই আখ বন্ধ না রেখে আখ চাষ আরও বাড়ানো উচিত। ১৯৩৪ সালে ধানের দাম গিয়েছে মণ প্রতি ২॥৵০। সে বৎসর গুড়ের দাম গিয়েছে ৩৵০।

নদীয়া জেলায় কৃষ্ণনগরের দিকে তুলোর চাষ করা উচিত। ঐ ১৯৩৫ সালে তুলোর মণ গেছে ২০৲ টাকা করে। সেইজন্য চাষীর উচিত হচ্ছে তুলোর দিকে লক্ষ্য দেওয়া। এখনও

ভারতের তুলোয় ভারতের অভাব মেটে না। সেইজন্য ভারতবর্ষের চাষীদের উচিত হচ্ছে তুলো চাষের দিকে লক্ষ্য রাখা। তারমধ্যে বাংলার চাষীরা যদি ভাল তুলোর চাষ করতে পারে, তা'হলে তাদের প্রচুর টাকা আসবে এটা নিশ্চিত।

তারপর আসে দুটি জেলা—বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ। এ দুটি জেলার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। কাজেই এ দুটোর সম্বন্ধে একটু বেশী আলোচনা করা উচিত।

বীরভূম হচ্ছে বর্দ্ধমান বিভাগের সব চেয়ে উত্তরের জেলা, এর পাশাপাশি হচ্ছে মানভূম ও সাঁওতাল পরগণা। কাজেই সাঁওতাল পরগণা বা মানভূম জেলা বল্‌লে আমরা যেমন বন-জঙ্গল ভরা একটা পাহাড়ে জেলা বুঝি—সেখানে এখনও অর্দ্ধ সভ্য জাতের বাস রয়েছে—বীরভূম বল্‌লেও সে রকম খানিকটা বুঝতে হবে। এর মধ্যেও বন-জঙ্গল রয়েছে—বড় বড় পাহাড় না থাক্ পাহাড়ে মাটী রয়েছে—বাংলার এটেল মাটীর বদলে অনেক বেলে জমি রয়েছে—তাছাড়া এর মধ্য দিয়ে ময়ূরাক্ষী ও অজয় নদ বয়ে গেলেও তাতে যে চাষবাসের বিশেষ উপকার হয়, তা নয়। ঐ বর্ষার সময় হু হু করে বান আসে, তারপর অন্য সময় নদীতে সামান্য জল ঝির্ ঝির্ করে বয়ে যায়। যদি ক্যানাল করে বর্ষার সময়ের জল আট্‌কে রাখতে পারা যায়, তা'হলে চাষবাসের অনেক সুবিধা হতে পারে।

বীরভূমে বেসরকারী পক্ষ হতে ক্যানাল কেটে ৫১০১ একর

জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। কাজেই সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, চাষীরা সম্মিলিত হয়ে কয়েকজন বুদ্ধিমান্ কার্য্যোৎসাহী লোক নিয়ে বড়ো সমবায় স্থাপন কর্‌লে অনায়াসেই ক্যানাল হতে পারে। এই ক্যানাল হলে বীরভূমে চাষের অনেক উন্নতি হ'তে পারে বলে বোধ হয়। আর ক্যানাল ছাড়াও পুকুর, কূয়ো ইত্যাদিও বাড়িয়ে জমিতে ভাল জলসেচের ব্যবস্থা করা বীরভূমে দরকার।

বীরভূমে এখন ধান হচ্ছে ৭১১,৯০০ একরে, আখ হয় ৯১০০ একরে, তুলো আর পাট একেবারেই হয় না। ফল তরকারী হয় ১০,৩০০ একরে। এ ছাড়া বীরভূমে জঙ্গল রয়েছে অনেক—বিশেষতঃ উত্তর পশ্চিম দিক্‌টায় বেশ জঙ্গল রয়েছে। বীরভূমের যা জমি এতে চাষ কর্‌লে তুলো বেশ ভাল হ'তে পারে। কেবল মাঝে মাঝে কিছু জলসেচের ব্যবস্থা করা দরকার। যাই হোক্, জলের বন্দোবস্ত হ'লে পরে, বীরভূমে বেশ ভাল ভাবে তুলোর চাষ করা উচিত। তুলো ছাড়া আখও বীরভূমে বেশ ভাল হবার সম্ভাবনা রয়েছে। বেশ ভাল করে কইম্বাটোর আখ চাষ কর্‌তে পার্‌লে বীরভূমে আখ চাষ হতে বেশ লাভ করতে পার্‌বে বলে মনে হয়। এমন কি জলের বন্দোবস্ত থাকলে ঘুটিং জমিতে কমলালেবু পর্য্যন্ত পারে।

তরিতরকারীও বীরভূমে ভাল হবার আশা রয়েছে। এখানে

পটল বেশ ভাল হয়। বীরভূমের জমিতে পেঁপেঁ বেশ ভাল হতে পারে বলে মনে হয়। সিংহলের বীচিতে যে গাছ সে গাছ এখানে বেশ হতে পারে। চিনাবাদামও এ জেলায় যথেষ্ট পরিমাণে ফল্‌বে বলে আশা করা যেতে পারে।

বীরভূম জেলায় এখন গরুর খাবারের চাষ হচ্ছে মাত্র ৫০০ একরে। কিন্তু এ জেলায় গরু বলদ বাছুর মিলিয়ে মোট সংখ্যা হচ্ছে ৬৪১০৫৩। এখন এতগুলি গরুবাছুরকে অন্ততঃ বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হলেও অন্য জেলা হতে খাবার আনা দরকার। কিন্তু চাষী যদি নিজের জেলার মধ্যেই খাবার পায়, তাহ'লে তাদের নিশ্চয়ই কম খরচ পড়্‌বে, এইজন্য এখানে অড়হর, হাতিঘাস এমন কি আখও (আখ সাইলেজ করে দিলে গরু বাছুরের খুব উপকার, গরুরা খেতেও ভালবাসে) চাষ করা যেতে পারে। আর তাতে আর একটা উপকার হবে। অড়হর, হাতিঘাষ ইত্যাদি চাষ করায় অনুর্ব্বর জমিও আবার ক্রমশঃ ক্রমশঃ উর্ব্বর হবে। কাজেই এসব চাষ কর্‌লে গরুরও উপকার হবে আর জমিও উর্ব্বর হবে, এই দুই দিক দিয়েই চাষার লাভ হবে।

আর বীরভূমে যে সব জমি জঙ্গল হয়ে পড়েছে সে সব জমিও আবার ক্রমশঃ চাষ করার যোগ্য করে তুল্‌তে পারা যায়। এ সম্বন্ধে কেমন করে সাঁইথিয়া হতে কিছু দূরে ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে শ্রীযুত রজনীকান্ত মুখুয্যে মহাশয়

শরের গভীর জঙ্গল কেটে চাষের জমি করে এনেছেন —সেটা উল্লেখযোগ্য। ক্রমশঃ ক্রমশঃ চাষ দিয়ে দিয়ে আর তার পরে জল সেচের ব্যবস্থা করেই প্রধাণতঃ জঙ্গল নষ্ট করে চাষের জমি অনেকটা উদ্ধার কর্তে পেরেছেন। অবশ্য দায়িত্বহীন ভাবে কেবল জঙ্গল কেটে যাওয়ারও বিপদ রয়েছে—কারণ জঙ্গল থাক্‌লে বৃষ্টি হয়—বিশেষজ্ঞদের এই মত, কিন্তু যাই হোক্ যে জমিতে আগে চাষ হতো, এখন জঙ্গল হয়ে পড়েছে, সে সব জায়গা এই রকমে উদ্ধার করার চেষ্টা মন্দ নয়।

বীরভূম সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলা যায়—কিন্তু সেটা এখানে বড় দীর্ঘ হয়ে পড়্‌বে। তবে বীরভূম সম্বন্ধে কথা বলতে হলেই এই কথাটা আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে, যে বীরভূমের প্রধান সমস্যা হচ্ছে জল সেচের সমস্যা।

মুর্শিদাবাদ জেলাটা আবার বীরভূম হতে অনেকটা অন্য ধরণের। বীরভূমে গেলে বুঝতে পারা যায় যে এখানেও বিহারের চেহারা যেন উঁকি মার্‌ছে। কিন্তু মুর্শিদাবাদে এলেই বল্‌তে পারা যায় যে বাংলা তার প্রভাব বিস্তার কর্‌তে সুরু করেছেন। মুর্শিদাবাদে বীরভূমের রুক্ষ শ্রী কেটে গিয়ে শ্যামলতার প্রভাব বুঝ্‌তে পারা যায়। এখানে কোন ফসল কতো হয়, তা হতেই এটা বুঝতে পারা যাবে।

মুর্শিদাবাদে ধান হচ্ছে ৭০৬,৪০০ একরে, পাট ২৪,৭০০

একরে, ফলতরকারী হয় ৫৩,২০০ একরে, তামাক ১৪০০ একরে, আখ ৪৩০০ একর, মসলা ৮৫০০ একর, রেড়ি ৩৮৬০০ একর, সর্ষে ২২,৭০০ একর, আর একটা জিনিষ, যা বাংলার অন্য কোন জেলায় হয় না—তুঁতে ১৪০০ একর, ছোলা ১৫৩,৮০০ একর, ৪৩০০ একর আখ।

এখন এর মধ্যে লাভের ফসল হচ্ছে সর্ষে, ধানের দর যখন ২৷৷/০ করে তখন সর্ষের দর গিয়েছে ৩৷/০ করে। সর্ষেতে পরিশ্রমও কম দরকার আর লাভও হচ্ছে বেশী। তবে সর্ষে চাষ একটু কমবার দিকে ঝোঁক দিয়েছে। আগে যেখানে ২২৭০০ একর জমিতে সর্ষে হত, এখন সেখানে গেল বছর ২০৭০০ একর চাষ হয়েছে। যাতে সর্ষে চাষ না কমে সে দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

মুর্শিদাবাদে আখ চাষ হয় ৪৩০০ একর কিন্তু গেল বছর যেটা কমে গিয়ে ২৯০০ একর মাত্র চাষ হয়েছে। আখ চাষ মুর্শিদাবাদে কোন মতেই করা উচিত নয়। যদি এখানে কইম্বাটোর আখ চাষ করা যায়, তা হলে সাধারণতঃ—চাষীরা বেশ লাভবান্ হবে।

চিনির কলওয়ালারা আখে মণ পিছু ।০ আনা দাম দেন। এই কইম্বোটোর আখ ২০০৷২৫০ মণ এক বিঘায় হয়। সেইজন্যে এ আখ কলে বিক্রি করলে বিঘা প্রতি ৫০৷৬০ টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু এক বিঘায় ধান মণ দশএর বেশী

সাধারণতঃ হয় না। আর সেই ধানের দাম ২৷৵০ করে (১৯৩৫)—তা হলে বিঘা প্রতি ধানের আয় ৩০৲ টাকার বেশী নয়। অথচ আখে সেখানে ৫০।৬০৲ টাকা পাওয়া যেতে পারে। সেই জন্যে আখ চাষের দিকে ঝোঁক রাখা উচিত।

মুর্শিদাবাদে ফল ও তরকারীর হবার যথেষ্ট সুবিধা রয়েছে। বহুদিন হতেই মুর্শিদাবাদ বহরমপুরের আম প্রসিদ্ধ। মুর্শিদাবাদের মধ্যে প্রচুর আমবাগান রয়েছে। কিন্তু সে আম ঠিক সময়ে কলকাতার বাজার বা অন্য কোন বাজারে নিয়ে যেতে পারলে বাগান হ'তে যথেষ্ট লাভ হ'ত। কিন্তু এখনও সে সে সুবিধা হয়ে উঠেনি। এখন এ অসুবিধা দূর করতে হ'লে ছোট বড় অনেক রাস্তা চাই—রেলের কিছু বিস্তার হলে ভাল হয়। আর এই ফলের সঙ্গে তরকারীর চাষও চালাতে হবে। মুর্শিদাবাদের জমিতে বিশেষতঃ খাগড়ার দিক্ দিয়ে পটল বেশ ভাল হয়,—পানও মন্দ হতে পারে না।

বেলডাঙ্গার প্রভৃতি অঞ্চলে দিয়ে এ সব হচ্ছেও। তাছাড়া এখানে চেষ্টা করলে ভাল তরমুজ হবার আশা রয়েছে—কারণ মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ খেঁড়ো তরমুজেরই একরকম অপকৃষ্ট জাত। এছাড়াও এখানে টোম্যাটো, স্কোয়াশ প্রভৃতির চাষ করে কল্‌কাতায় চালান দিতে পারলে যথেষ্ট লাভের আশা করা

যায়। এ বিষয়ে মুর্শিদাবাদের চাষীদের নজর দেওয়া দরকার।

পাট এখন এখানে হচ্ছে ২৪৭০০ একরে, কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে এখানে পাট চাষ ৫০০০ একর কমান উচিত। এই পাটের পরিবর্ত্তে মুর্শিদাবাদে খানিকটা তুলোর চাষ হতে পারে। মুর্শিদাবাদের উত্তর দিকে জঙ্গীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে তুলোর চাষ হওয়া সম্ভব হ'তে পারে বলে মনে হয়। তুলোতে সব জায়গাতেই বেশ লাভ থাকে। নদীয়ায় তুলোর মণ ২০৲ টাকা।

মুর্শিদাবাদে গরুর খাবার হয় ১৭৪০০ একরে। কিন্তু গেল বছর চাষ হয়েছে ১০৬০০ একর। মুর্শিদাবাদ জেলায় গরু বলদ বাছুর মোট ৬৭০২৬৭, সেই জন্যে মুর্শিদাবাদে গরুর খাবার কমা ভাল লক্ষণ নয়। গরুর খাবারের জন্য চাষের জমি কম্‌লে কোন ভাবনার কারণ থাকে না সেইখানে যেখানে প্রচুর চরবার জায়গা রয়েছে—বা যেখানে গরু অনেক স্বতঃ উৎপন্ন খাবার পায়। মুর্শিদাবাদ জেলায় দুটোই কম—এখানে এক বিঘে জমিতে প্রায় ২০টা গরুকে চর্‌তে হয়—সারা বছর আর আর স্বতঃ উৎপন্ন খাবারও বেশী হয় না। সেই জন্যে এই জেলার গরুকে ভাল রাখ্‌তে হ'লে গরুর খাবারের চাষের দরকার।

মুর্শিদাবাদে তিলের চাষ আরও বাড়্‌তে পারে। এখানে

রেড়ি হচ্ছে ২৫০০০ একর, কিন্তু তিল অনেক কম, ৩৫০০ একর। অন্যান্য সব জায়গাতেই সাধারণতঃ তিলের চাষ কম হয়—কিন্তু তবুও এখানে তিলের চাষ আরও বাড়্‌তে পারে। আর তিল চাষে লাভ আছে।

এরপর মুর্শিদাবাদের নিজস্ব জিনিষ তুঁতে চাষের উল্লেখ বলেই মুর্শিদাবাদের কথা শেষ কর্‌বো। মুর্শিদাবাদে রেশমের পলুকে খাওয়াবার জন্যে ১৪০০ একরে তুঁতে চাষ হয়, এখন রেশমের বেশী চাহিদা না হ'লে, বেশী পলুর দরকার না হলে তুঁতে চাষ বাড়ান চল্‌বে না, তাই তুঁতে চাষটা ঠিক চাষ নয়, ওটা অনেকটা রেশম ব্যবসারই মধ্যে। মোটামুটী ভাবে এই গেল মুর্শিদাবাদ ও পশ্চিম বাংলার কথা।

আমাদের প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে উৎসাহী মাথা-ওয়ালা লোক দরকার হয়ে পড়েছে। তাঁরা প্রত্যেক গাঁয়ে কোথায় কি ফল্‌তে পারে সে সব ঠিক করবেন। চাষীদের সেই সব জায়গায় সে সব জিনিষ চাষ কর্‌তে অনুরোধ করবেন, তার উপযুক্ত সার তার চাষের প্রণালী এ সমস্তই চাষীকে বুঝিয়ে দেবেন। তা না হলে কেবল মুর্শিদাবাদে তুলোর চাষ হওয়া দরকার বা বীরভূমে চিনাবাদাম চাষ করা দরকার এতে ততো ফল হবে না। প্রথমে অবশ্যই জানা চাই এ জেলায় কি কি চাষ দরকার কিন্তু তারপর প্রত্যেক গ্রাম ধরে ধরে ব্যবস্থা করা দরকার।

আর এ ছাড়া যে সব জিনিষ চাষ কর্‌তে বলা হয়েছে তার মানে এ নয় যে সব জিনিষ হচ্ছে সে সব জিনিষ একেবারে ছেড়ে দিতে হবে। যেমন মুর্শিদাবাদে তিলের চাষ বা আখ চাষ করতে হবে বলে যে ধান চাষ একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে তা মোটেই নয়। কেবল ধীরে ধীরে সেগুলিকে চাষ কর্‌তে হবে। যেমন একটা ক্ষেতে হয়ত কয়েক বছর ধান হওয়ার পর ভাল ধান হচ্ছে না। চাষী হয়তো সেটাকে এবছর ফেলেই রাখ্‌বে। সেইখানে ধানের বদলে আখ লাগান হ'ল। সেবার আখ যদি ভাল হয়, তখন চাষী নিজেই পরের বছর সেখানে যত্ন করে আখ লাগাবে। এমনই করে দুইএক বছর যেতে যেতে যদি সে দেখে যে আখেই তার ভাল লাভ হচ্ছে—সে তখন যেখানেই সুবিধামত বাড়্‌তি জমি পাবে সেইখানেই আখ লাগাবে।

আমাদের দেশে এমন করেই আস্তে আস্তে নানা রকম ফসলের প্রচলন হওয়া উচিত। তা না হ'লে একদিনে যদি সমস্ত ধান পাট বন্ধ করে দিয়ে আখ, নেপিয়ার ঘাস বা চিনে-বাদামের চাষের প্রচলন করার চেষ্টা করা হয়—তা'হলে সেটা সুচিন্তিত ভাবে হবে না—আর তাতে দেশে একটা বিপর্য্যয় এসে উপস্থিত হবে। সেটার উপর চাষীদের নিজস্ব বলে একটা কোন দখল আস্‌বে না—সেটাকে চাষীরা গ্রহণ করার বদলে যত শীঘ্র পারে ছেড়ে ফেলে দেবে। তাই এসব জিনিষ

উপর হ'তে চাষীদের উপর চাপিয়ে না দিয়ে, চাষীদের অন্তরে এই সব জ্ঞান জাগিয়ে দিয়ে, তাদের অন্তর হ'তে এই রকম চাষের ইচ্ছা বার কর্‌তে হবে, তা'হলেই উন্নত প্রণালীতে চাষ আপনা থেকে হবে—আর সে চাষ যে স্থায়ী ও সফল হবে সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। *

* এ অধ্যায়ের শেষ অংশে প্রত্যেক জেলায় প্রত্যেক ফসলের জমির পরিমাণ—Season & Crop Reportএর তৃতীয় পরিশিষ্টের Normal column হইতে সংগৃহীত। ফসলের দামও উক্ত রিপোর্টের ষষ্ঠ পরিশিষ্ট হইতে গৃহীত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কুটীরশিল্প।

নব যুবক যাতে চাকরীর উমেদারী না করে শিল্পোন্নতির কাজে এবং ব্যবসাবাণিজ্যে প্রবৃত্ত হ'ন—সর্ব্বত্রই আমার এই নিশান।

—প্রফুল্লচন্দ্র

বাংলার চাষী সম্বন্ধে কোনও কথা বল্‌তে হলে সাধারণতঃ বাংলার চাষ-বাসের কথাই বল্‌তে হবে—তার চাষের কি কি অসুবিধা, অনুন্নতি, আর কি করে সেই সব অসুবিধা দূর হয়ে গিয়ে উন্নত প্রণালীতে চাষ হবে, আর তাতে চাষীর আয় বাড়্‌বে,—এই সব কথা নিয়েই থাক্‌তে হবে—আর পূর্ব্ব পাঁচ অধ্যায়ে সেই সব কথাই কিছু কিছু বল্‌বার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু বাংলার চাষীর সঙ্গে কুটীর শিল্পের যে কোথায় যোগ—তা সাধারণতঃ আপাতঃদৃষ্টিতে খুঁজে পাওয়া যায় না!

কিন্তু ভাল করে দেখ্‌লে চাষীর কথার মধ্যে কুটীরশিল্পের যে কি স্থান সেটা খুজে পাওয়া যাবে। আমাদের দেশের চাষীদের একমাত্র নির্ভর চাষের উপরে। চাষ ছাড়া তার আয়ের অন্য কোন উপায় নাই। তাই যে বছর চাষ ভাল হ'ল না বা ধান চাল সস্তা হয়ে গেল—সে বছর চাষীদের সর্ব্বনাশ। তাদের যা কিছু সামান্য আয়, সব বন্ধ হয়ে যায়—

তাদের ধার ভিন্ন সংসার চালাবার উপায় থাকে না। এই রকমে চাষের অভাবে তাদের জীবনযাত্রা চালানো দুষ্কর হয়ে পড়ে।

এ অবস্থা দূর কর্‌তে হলে চাষের উন্নতি করতে হবে—চাষ থেকে যাতে বেশী আয় হয়, চাষ যাতে কোনবার বিফল না হয়, সেইসব চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু তবুও একমাত্র চাষের উপর নির্ভর করে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আর তা ছাড়া আমাদের দেশে চাষে এতো আয় বাড়ান সহজে সম্ভব নয় যাতে চাষী খুব সচ্ছলভাবে জীবন যাপন কর্‌তে পারে। সেই জন্য চাষীদের আর একটা আয়ের পথ দেখিয়ে দিতে হ'বে।

সেই আয়ের সবচেয়ে সহজ পথ হ'চ্ছে কুটীরশিল্প—আমাদের বাংলার গ্রামে গ্রামে বিনা কলে এতদিন যে সব শিল্প চলে এসেছে সেই সব শিল্প। তাঁতে কাপড় বোনা হবে বা হাপরে তাতিয়ে লোহার জিনিষ তৈরী হবে—গুড় হবে কাঁসারি কাঁসার কাজ কর্‌বে, শাঁখারী শাঁখা তৈরী কর্‌বে—এসবের জন্য বড় বড় চিম্‌নিওয়ালা কলের দরকার হয় না। বাংলার ঘরে ঘরে, শান্ত গাছতলায়, কুটীরে এইসব শিল্প চলে এসেছে, এসব বাঙ্গালীর মজ্জাগত। কাজেই এইসব শিল্পই সহজেই পুনঃস্থাপিত হবে, আর চাষীদের আয় বাড়াবে।

কুটীর শিল্পের ক্ষমতা যে বড় কম তা নয়। বড়ো বড়ো উন্নত দেশেও কুটীর শিল্পের স্থান নীচুতে নয়। জার্ম্মানীতে

প্রায় শতকরা নব্বইটী শিল্প কুটীরশিল্প আর সমস্ত জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় দুই পঞ্চমাংশ এই শিল্প হ'তে জীবিকা সংগ্রহ করে। আবার জাপানে ১৯২৮ সালে,, যে ৫৫৯৪৮টী ফ্যাক্টরী স্থাপিত হয়েছিল তাদের মধ্যে প্রায় শতকরা ৫০টী ফ্যাক্টারীতে মোটে ৫ হতে ৯জন লোক কাজ করে। আর এদের মধ্যে মাত্র শতকরা ৬টী ফ্যাক্টারীতে ১০০০ জন লোক কাজ করে। বাস্তবিক জাপানের চাষীরা যে এত কম দামে ফসল ছাড়তে পারে, তার কারণই হচ্ছে যে চাষ তাদের একমাত্র নির্ভর নয়। তারা উন্নত প্রণালীতে চাষও করে—আবার অবসর সময়ে এই কুটীরশিল্পে হাত দেয়। সে হয়তো চাষে যা পায়, গালার কাজ করে তার সমানই পায়। কাজেই যদি একবছর তার ফসল নাও হয়—তাহলেও তাকে পথে বস্তে হবে না—গালার কাজ বা অন্য রকম কুটীরশিল্পের আয় থেকেই তার একরকম চলে যাবে। এইজন্য সে যখন ভাল ফসল পায়, তখন সে ফসল অল্পদামে ছাড়লেও তার কোন ক্ষতি হয় না। জাপানে চাষীরা কুটীরশিল্প হতে যথেষ্ট আয় পায় বলে তারা ফসল এতো কম দামে ছেড়ে দিতে পারে যে সে ফসল অনেক সময় বিদেশে গিয়েও সস্তা দামে বিক্রি হয়। কিন্তু বাংলার চাষীর তো সে অবস্থা নয়। কমদামে ফসল ছাড়া মানেই তার পক্ষে অনাহার।

সেইজন্যে আমাদের দেশে চাষীর অবস্থার উন্নতি করতে

হলে, তার ভাগ্য ভাল করতে হলে, চাষের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই কুটীরশিল্পের প্রচলন ও উন্নতি কর্‌তে হবে। চাষীদের এসব শিখ্‌তে সময় লাগবে না কারণ বহুপুরুষ হতে তাদেরই ঘরের আশে পাশে এসব শিল্প চলে এসেছে এর সঙ্গে তাদের জন্মাবধি পরিচয় থাকে। আর এই কুটীরশিল্পের জন্য সময়ের ও অভাব হবে না।

এক সরকারী কমিটী বলেছেন যে আমাদের দেশে চাষীরা সাধারণতঃ মাস চারেক চাষের কাজে ব্যস্ত থাকে আর বাকী আট মাস তাদের হাতে বিশেষ কিছু কাজ থাকে না। কথাটা সত্যি। ঐ বর্ষাকাল বা তার কিছু পূর্ব্ব হতে চাষীরা চাষের কাজে লাগে আর কার্ত্তিকমাস নাগাদ তাদের সব কাজ শেষ হয়ে যায়—আর বাকী ক'মাস তাদের পুঁজি ভেঙ্গে খেতে হয় আর বসে থাক্‌তে হয়। কিন্তু তারা যদি এই অবসর সময়টাতে কুটীরশিল্পে হাত দেয় তাহলে তাদের অবসরের অভাব হবে না—আর আয়ও অনেক বাড়বে।

এই কুটীরশিল্পের ক্ষমতা বড় কম নয়, ছোট জিনিষ হলেও এর সংহতি অনেক সময় বড়ো বড়ো ব্যবসাকে পর্য্যন্ত কায়দা করে রেখে দেয়। বহু জায়গাতেই দেখা যায় যে কুটীরশিল্পের জিনিষ ব্যবসায়ীদের জিনিষের চেয়ে কোন অংশে খারাপ নয় আর লোকে বেশীরভাগ ব্যবসায়ীদের জিনিষ ছেড়ে কুটীরশিল্পীর জিনিষই কেনে। উদাহরণ স্বরূপ বল্‌তে পারা যায় যে বাংলার

গ্রামে এখনও অনেক যায়গায় তাঁতে বোনা কাপড় বেশী টেকসই বলে চাষীরা মিলের কাপড় ছেড়ে তাঁতের কাপড় কেনে। আবার দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে দিনাজপুরে কাপালি জাত পাট হতে যেসব থলে বা চট্‌ বুন্‌তো, বোম্বাইএ বহুদিন পর্য্যন্ত মিলের চটের চেয়ে তারই বেশী আদর ছিল। এই রকমে দেখা যায় যে কুটীরশিল্প যে কেবল নিজে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারে তা নয়, এমন কি বড় বড় ব্যবসার সঙ্গে লড়াই পর্য্যন্ত কর্‌তে পারে।

আর তাছাড়া এমন কতকগুলি জিনিষ আছে—যেখানে বড় ব্যবসা ঢুক্‌তেই পারে না, কুটীরশিল্পই সেখানে একমাত্র দাঁড়িয়ে আছে—যেমন পূর্ব্বে বাংলার মস্‌লিন্‌ বা এখনও কাশ্মীরে শাল বোনা, এখানে মিল ঢুক্‌তে পারে না কারণ এর যে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য, তা মিলে সম্ভব নয়। এই রকম কতকগুলি জায়গায় কুটীরশিল্প অপ্রতিদ্বন্দ্বী, আর সে জায়গায় এসব শিল্পের আয় বেশ মোটা।

এই রকমে দেখা যায় যে যদি ভালভাবে কুটীরশিল্প চালাতে পারা যায় তাহলে সে যে ক্রমশঃ বড় হবে আর তা থেকে যে আয়ও বেড়ে চল্‌বে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেইজন্য চাষীরা যদি উৎসাহের সঙ্গে কুটীরশিল্প সুরু করে, তার জিনিষ পত্র সমবায়ের সাহায্য নিয়ে বেচ্‌তে আরম্ভ করে, তাহলে তাদের আয় নিশ্চয়ই বাড়্‌বে এতে কোনই সন্দেহ নেই।

সেইজন্যে বাংলায় সাধারণতঃ কি কি কুটীরশিল্প চল্‌ছে, আর সেটা এখন চাষীরা কি ভাবে নিতে পারে, আর অন্যান্য কি কি কুটীরশিল্প এখন চলা সম্ভব, সেই কথা আলোচনা করেই এ অধ্যায় শেষ কর্‌ব।

এক একটা করে কুটীরশিল্প আলোচনা করার আগে আর একটা কথা আমাদের বলা দরকার। কুটীরশিল্পের উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি সেই শিল্পজাত জিনিষ বিক্রির জন্য সমবায় না গড়ে ওঠে, তাহলে কুটীরশিল্প হ'তে চাষীরা ততোটা লাভ পাবে না। সেও অল্পদামে বিক্রি হয়ে যাবে আর হয়তো কুটীরশিল্পের যা সামান্য খাটুনি, তাও পুষিয়ে উঠবে না। কিন্তু বিক্রির জন্য যদি সমবায় থাকে, তাহলে ঐ কুটীরশিল্পের জিনিষ বেশ একসঙ্গে দামে বিক্রি হবে। যদি কোন গ্রামে তার চাহিদা নাও থাকে, তা হলেও অন্যগ্রামে সে সব জিনিষ নিয়ে গিয়ে ন্যায্য দামে বেচা সম্ভব হ'বে। আর এতে যে কেবল বিক্রিরই সুবিধা হবে, তা নয়; যদি চাষীরা শিল্পের জন্য সব জিনিষপত্র কিন্‌তে অসমর্থ হয়, তাহলে তা সমবায় ধারে কিনে দিতে পার্‌বে। এরকমে সঙ্গে সমবায় থাক্‌লে কুটীরশিল্পের যথেষ্ট উন্নতির আশা করা যায়। এইবার আমরা এক একটী করে কয়েকটী প্রধান কুটীরশিল্পের কথা আলোচনা কর্‌ব।

তাঁত বোনা।

বাংলার কুটীরশিল্পের কথা বল্‌তে গেলেই সব প্রথম মনে

আসে কাপড় বোনার কথা। বাংলায় এই শিল্পটা এক কালে খুবই সমৃদ্ধ হয়েছিল—আর এর উন্নতিও হয়েছিল চরম। ঢাকায় যে মল্‌মল্‌খাস্‌, সান্ধ্যশিশির আর স্রোতের জল—এই তিন রকমের মস্‌লিন ছিল, তা বোধ হয় সারা জগতে সকল যুগের মধ্যে কাপড় বোনার চরম উৎকর্ষ। আর এ সরু ও পাতলা কাপড় ছাড়াও সাধারণের জন্য অপেক্ষাকৃত মোটা কাপড়ও বাংলার তাঁতী এতো সুন্দর বুন্‌তো যে, সে সব কাপড় বিদেশ পর্য্যন্ত যেতো। শোনা যায় নাকি ইটালি বা ফ্রান্স প্রভৃতি দেশেও বাংলা হতে কাপড় গিয়েছে। আর ঢাকা ছাড়া শান্তিপুরেও মস্‌লিন বোনা হ'ত। প্রথমে এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটা কুঠী ছিল, আর সেইখান থেকে বিলেতে মস্‌লিন ও অন্যান্য কাপড় চালান যেত। একথা আরো কিছু পূর্ব্বে বার্ণিয়ার সাহেবও বলে গেছেন। তিনি বলে গেছেন যে একমাত্র ডাচ্‌ বণিক্‌রাই বাংলা থেকে নানা রকমের এতো কাপড় রপ্তানি কর্‌তো যে সেই একটা আশ্চর্য্যের বিষয়। আর ডাচ্‌ ছাড়াও তখন ইংরেজ ও পোর্টুগীজ বণিক্‌রাও এই কাপড় রপ্তানির ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল। কাজেই দেখা যায় যে তখন বাংলা বহুপরিমাণে জগতের কাপড়ের অভাব দূর করেছে।

কিন্তু ক্রমশঃ ক্রমশঃ এ শিল্পের অবনতি সুরু হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁতীদের সেই আঙ্গুল কাটার পর থেকেই ক্রমশঃ ক্রমশঃ এই অবনতি সুরু

হয়েছে (যদিও অধ্যাপক যোগীশচন্দ্র সিংহ এটা স্বীকার করেন না)। যাই হোক্, মোট কথা সে সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁতীদের আঙ্গুল কাটুন আর নাই কাটুন, এটা ঠিক কথা যে যাতে এই তাঁত বোনাটা কমে আসে সেজন্য তাঁরা সচেষ্ট ছিলেন কারণ তাতে তাঁদের লাভ হবে। আর সেই সময় আরও একটা জিনিষ এই কুটীরশিল্পকে আঘাত কর্‌লে। কুটীরশিল্পে যা সব ভাল ভাল সূতোর জিনিষ হতো, সেটা মোগল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা পেতো, মোগল রাজত্ব যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই পৃষ্ঠপোষকতা লুপ্ত হল,—সেই জন্য এই তাঁতবোনা অনেকটা পিছিয়ে গেল।

এই ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গেই তখনকার সরকার যাতে বিলিতি জিনিষ বিক্রি হয় এজন্যে চেষ্টা করতে গিয়ে তাঁতে বোনা কাপড়ের উপরে শুল্ক বসালেন, কিন্তু বিলিতি কলের কাপড় বিনা বা অল্প শুল্কে আস্‌তে লাগল। এক কথায় বল্‌তে গেলে উইলসন্ সাহেব যে কথাটা বলেছেন—সেই কথাটাই বল্‌তে হয়, "বাষ্পের জোরে ম্যাঞ্চেষ্টারের কল চলেনি—সে কল চলেছে ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বাংলার তাঁতীর স্বার্থ বলি-দানের ফলে।"

কিন্তু এতো বাধা সত্ত্বেও তাঁতবোনা বাংলায় টিকে রয়েছে, এমন কি তারা এপর্য্যন্ত মিলের সঙ্গে পাল্লাও দিয়ে এসেছে। ১৮৯৬ সালে তাঁতে ৩ কোটী মণ সুতো বোনা হয়েছিল, আর

মিলে মাত্র ২৫০০০০০ মণ স্থতো বোনা হয়েছিল। ১৯০১ হতে ১৯০৫ সালের মধ্যে হাতে বোনা তাঁতে মিলের প্রায় দ্বিগুণ স্থতো বোনা হয়েছিল। ১৯০৯ সালে তাঁতে ১১১ কোটি ৬০ লক্ষ গজ সূতো বোনা হয়েছিল। কিন্তু মিলে মাত্র ৮২ কোটি ৪০ লক্ষ গজ স্থতা বোনা হয়েছিল। তারপর থেকে অবশ্য মিলে বোনা সূতোর পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে। ১৯১৭ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে তাঁতে গড়ে বছরে ২০ কোটি পাউণ্ড সূতো বোনা হয়েছে, কিন্তু মিলে হয়েছে ৩৩ কোটি পাউণ্ড। মাঝে স্বদেশী প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে হাতে বোনা তাঁতের কাপড় আবার চলেছিল—আবার তার উন্নতির আশা খুব বেশী পরিমাণে দেখা দিয়েছিল, তারপর সেটা অনেকটা কমে গেলেও তাতে তাঁতের অনেকটা উন্নতি হয়েছে। ১৯২৯-৩০ সালে তাঁতে ৩৫ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড মিলের সূতো নিয়ে ১৪০ কোটি ৪০ লক্ষ গজ কাপড় বোনা হয়েছিল, মিলে বোনা হয়েছিল ২৪১ কোটি ৮০ লক্ষ গজ।

এই হতেই দেখা যায় যে মিল হওয়া সত্ত্বেও এবং বিদেশ হতে মিলের কাপড় আসা সত্ত্বেও আমাদের দেশে এখনো তাঁত বোনা বেশ ভাল রকম টিকে আছে—আর বহুলোকের জীবিকা হয়ে রয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে যে এখনও বর্দ্ধমান জেলায় ৩৯৪২, বীরভূমে ৫৮৪৪, বাঁকুড়ায় ৮১৭৪, মেদিনীপুরে ১৫২৭৬, হুগলীতে ৫৯৮৮, হাওড়ায় ১০৯৯, ২৪পরগণায় ৯৭২,

নদেতে ৪৯২৫, মুর্শিদাবাদে ৭৩৬১, যশোরে ৬৯৩২, খুলনায় ৩৭৬২, রাজসাহীতে ৪৯৭, দিনাজপুরে ৩৯২৯, জলপাইগুড়িতে ২৫৪৫, দার্জ্জিলিংএ ৪৬৪, রংপুরে ৪০৪, পাবনায় ৮৬২২, বগুড়ায় ১৮৬৫, মালদহে ১৯২৮, কুচবিহারে ২০৮৩, ঢাকায় ১১৭৯৮, ময়মনসিংহে ১১৬২৯, ফরিদপুরে ৭৯৬২, বাখরগঞ্জে ৬৯২৯, ত্রিপুরায় ১২৪৩২, নোয়াখালিতে ৯০৩১, চট্টগ্রামে ৬৮১৮, পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে ২৯১৯০ আর ত্রিপুরা রাজত্বে ৩১৪৮৫ খানা তাঁত মোট ৩৭৬৪৪৯ খানা তাঁত চল্‌ছে আর তা থেকে প্রায় ৩৭৬৪৪৯ জন লোক জীবিকাধারণ করছে। কাজেই চাষের পরই এই তাঁতবোনার স্থান।

কিন্তু এইটুকুই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাঁতকে আরও ভালভাবে চালাতে পার্‌লে আমাদের দেশের চাষীর অনেক উন্নতি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের দেশে বিশেষজ্ঞেরা অনেক জায়গায় পাট কমিয়ে তুলোর চাষ কর্‌তে বল্‌ছেন। এখন যদি তুলো হতে কাপড় না হয়, তবে সে তুলো চাষের সার্থকতা কি? চাষীরা যদি তুলোর চাষ করে অথচ তাঁত না চালায় তাহ'লে বহু টাকা আবার মিলওয়ালার কাছে যাবে। কিন্তু তুলোর চাষের সঙ্গে যদি চাষী তাঁত চালায় তা হলে সেই টাকা মিলওয়ালার কাছে না গিয়ে, তার কাছেই থাকবে আর তাতে তার অবস্থার অনেক উন্নতি হবে।

আমাদের ভালভাবে তাঁত চালাতে হলে তাঁতের উন্নতি করা

দরকার। সাধারণতঃ আমাদের দেশে দুরকম তাঁত চলে আস্‌ছে ; এক হচ্ছে পুরাণো সাধারণ তাঁত আর একটী হচ্ছে ঠক্‌ঠকি তাঁত। বাংলার ২১৩৮৮৬ খানা তাতের মধ্যে মোটে ৫৩১৬৮ খানা মাত্র ঠক্‌ঠকি তাঁত। মোটে এত কম সংখ্যক ঠক্‌ঠকি তাঁত থাকায় খুব বেশী কাজ হয়ে উঠে না। বিলেতে যে সব হাতে বোনা তাঁত চলে সেগুলোতে আমাদের দেশের ঠক্‌ঠকি তাঁতের চেয়ে চারগুণ বেশী কাজ হয়। সে তাঁত কেবল হাতে চলে এই যা পার্থক্য—তা নইলে কাজের দিক দিয়ে কলের তাঁতের সঙ্গে তার বেশী কোন তফাৎ নেই। আমাদের দেশে যদি মিলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যদি তাঁত চালাতে হয় তাহা হইলে এই সব উন্নত ধরণের তাঁতের দরকার রয়েছে। আর এতদূর যদি নাও হয়ে ওঠে, তা হলে যাতে অন্ততঃ ঠক্‌ঠকি তাঁতেরও সংখ্যা বৃদ্ধি পায় সে বিষয়ে চেষ্টা কর্‌তে হবে। যেখানে যেখানে বেশী তাঁত চলে, সেই সব যায়গায় সমবায় সমিতি স্থাপনা করে এই সব তাঁত চালান সম্ভব। জিনিষ তৈরীর সময়ে এই সমবায় নতুন নতুন উন্নত ধরণের তাঁত প্রবর্ত্তনের চেষ্টা কর্‌বে। এই মুহূর্ত্তে যাতে আমাদের দেশে ঠক্‌ঠকি তাঁতই খুব বেশী চলে সেই দিকেই সমবায়ের খেয়াল রাখা উচিত।

এই সমবায় সমিতি তাঁতে বোনা কাপড় বিক্রির সময়েও সাহায্য কর্‌বে। আমাদের দেশে তাঁতিরা এক হাটেই তাদের

জিনিষ বিক্রি করে, কিন্তু এতে তাদের নিজেদের মধ্যেই প্রতি-যোগিতা এসে পড়ায় দাম কমে যায় আর এতে প্রত্যেকেরই ক্ষতি হয়। কিন্তু যদি একটী সমবায় সমিতি একটা ন্যায্য দাম দিয়ে তাঁতীদের কাপড় কিনে নেয়, তারপর বাজারের চাহিদা বুঝে একটা সমান দামে জিনিষ ছাড়্‌তে আরম্ভ করে তা হলে চাষীরাও একটা ভাল দাম পায়,—বাজারের দামটাও অনেকটা ঠিক থাকে—বেশ চার্‌দিক দিয়েই সুবিধা হয়। এখন যদি শান্তিপুর, চৌমোহানি, সোনামুখী, বিষ্ণুপুর, রামকৃষ্ণপুর, (হাওড়া) মধ্যাকুল (যশোহর) এই সব জাগায় তাঁতীরা এক একটী সমবায় করে কেবলমাত্র সেই সমবায়ের কাছেই জিনিষ বিক্রি করে, তাহলে সাধারণে কেবলমাত্র সেই সমবায়ের কাছ থেকে জিনিষ কিন্‌তে বাধ্য হবে—আর তাহলে সমবায় সাধারণের কাছ হতে ন্যায্য দাম দিতে পারে, এরকম হলে তাঁতীদের অবস্থা ফিরে যাবে—সেজন্য তাঁতের উন্নতি কর্‌তে গেলে এরকম সমবায়ের নিতান্ত দরকার।

তাঁতের উন্নতির জন্যে বিহার-সরকার যা করেছেন সেটী অন্যান্য সরকারের অনুকরণীয়। সরকার প্রথমে ইউরোপ প্রভৃতি দেশে যে সব ধরণের প্যাটার্ণ চলে সেই সব প্যাটার্ণগুলি আড়ত-দারের কাছে দিয়েছেন। আড়তদারেরা গিয়ে তাঁতীদের কাছে সেই সব ধরণের জিনিষের অর্ডার দিয়ে এসেছে। ইতিমধ্যে সরকার হতে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে তাঁতীদের সেই সব প্যাটার্ণ

বুন্‌তে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই রকম উপায়ে তাঁতীরা যখন বিদেশে চল্‌বার মতো বেশ ভাল জিনিষ তৈরী করে দিচ্ছে, তখন সেগুলো পাটনায় সরকার পরীক্ষা করে উপযুক্ত বিবেচনা করলে বিদেশে নিয়ে যাবার অনুমতি দেন। যাতে জিনিষটী ভাল হয় এজন্য সরকার তাঁতীদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন; যাতে তারা ভাল সুতো কেনে বা ভাল তাঁত বোনে এজন্য সরকার নজর দিয়েছেন। আর যাতে এসব জিনিষ বিদেশে বিক্রি তার জন্য মোট বিশটা কোম্পানী ছাড়া সরকার পক্ষ হতে ইউ-রোপে একটা, আর অষ্ট্রেলিয়ায় আর একটী দোকান খোলা হয়েছে। এতে সুফল পাওয়া গিয়েছে যথেষ্ট, এক বিলেতেই প্রায় লক্ষ টাকার জিনিষ বিক্রি হয়েছে।

আমাদের দেশে সরকারও অনায়াসে এরকম কর্‌তে পারেন, কিন্তু বাংলা সরকার যে শীঘ্র এরকম কর্‌বেন তা বলে মনে হয় না। যাই হোক্‌ যদি সরকার পক্ষ হতে চেষ্টা না হয়, তা হলে সমবায় করে এরকম প্রচেষ্টা খানিকদূর হতে পারে, বড়ো সমবায় হলে জিনিষ ইউরোপে পাঠানও অসম্ভব নয়। আর যদি অতো বড়ো সমবায় নাও হয় তা হলেও নতুন নতুন প্যাটার্ণ বোনা শেখান, নতুন তাঁত চালানো আর কাছাকাছি জায়গায় সে সব জিনিষ বিক্রি করা—এসব কাজ সমবায় কর্‌তে পারে।

তাঁতের জিনিষ বিক্রি কর্‌বার জন্য বিহার সরকারের এই

সব কাজের সঙ্গে সঙ্গে আরও কতকগুলো কথা বলা যেতে পারে। বিহার সরকার যা করেছেন তার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত জিনিষগুলির দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত—

(১) শিল্পোন্নতির জন্য প্রদর্শনীক্ষেত্র স্থাপনা (Demonstration station)।

(২) তাঁতীরা যাতে একেবারে সস্তায় সূতা কিন্‌তে পারে সেজন্য কেন্দ্রীয় সূতা ক্রয় সমবায় সমিতি হওয়া প্রয়োজন।

(৩) তাদের তৈরী জিনিষের প্রদর্শনী।

(৪) তাঁতে বোনা জিনিষ যে বেশী টেকসই তার প্রচার (Propaganda)।

(৫) তাঁতীদের শিক্ষার ব্যবস্থা।

(৬) এই সব জিনিষের জন্য রেলভাড়া কমানোর চেষ্টা।

(৭) যেগুলো এতদিন তাঁতীরাই করে অস্‌ছিল সেইরকম কতগুলি জিনিষ যাতে মিল না তৈরী করে তার জন্য আইন।

(৮) তাঁতীরা যাতে কেবল কাপড় না বুনে অন্যান্য জিনিষও বোনে তার চেষ্টা করা। সত্যি কথা বল্‌তে কি তাঁত হতে বেশ লাভ পেতে হলে কেবল কাপড় বুনলে হবে না, যেগুলো ভারতে বা ভারতের বাইরেও নানারকম কাজে লাগে—সেই

সব জিনিষের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে যেমন পর্দ্দা, ঝাড়ন, ডেক চেয়ায়েরর কাপড় ইত্যাদি। এগুলো আমাদের দেশের তাঁতে খুব ভাল হতে পারে—আর এর চাহিদা বিলাতী দেশেও যথেষ্ট রয়েছে। সেই জন্য এখন আমাদের এদিকেও একটু বেশী খেয়াল রাখা দরকার।

রেশম বোনা।

কাপড় বোনার পরেই বাংলার প্রধান কুটীর শিল্প হচ্ছে রেশম। এই রেশম শিল্প যে বাংলায় কতোকাল হতে চলে আস্‌ছে তার ইয়ত্তা নেই। মনু বা রামায়ণ মহাভারতেও এর উল্লেখ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। রোমের ইতিহাসে দেখ্‌তে পাওয়া যে জুলিয়াস সীজার যে সব সিল্ক ব্যবহার কর্‌তেন সে সব সিল্ক ভারতবর্ষ আর চীন হতে যেত। বিখ্যাত ঐতিহাসিক প্লিনির বইএ পাওয়া গিয়াছে যে, বছরে ইউরোপে প্রায় ১০ কোটী সেস্‌টারসি দামের সিল্ক ভারতবর্ষ আর আরব দেশে থেকে যেত।

আমাদের দেশবাসী যদি তার অবসর সময়ে বেশ ভাল ধরণের তাঁত নিয়ে আর বেশ যে সব জিনিষের চাহিদা আছে সেই সব জিনিষ তৈরীর দিকে লক্ষ্য রাখে—তা হলে তারা শীঘ্রই বহু জিনিষ খুব সস্তায় তৈরী কর্‌তে পারবে। সস্তা দাম হওয়ার কারণ হচ্ছে যে এটা তার অবসর সময়ের কাজ—উপ্‌রি লাভ। আর তার বাড়ীর সাহায্য সে যথেষ্ট পাবে—যার জন্য তার কোন

মজুরী লাগ্‌বে না। আর তাছাড়া আর একটা কারণও এই যে সামান্য কিছু পেলেই তার চলে যাবে তার জীবন যাত্রাও খুব অল্প ব্যয়সাধ্য। এই সব নানা কারণে চাষী যদি অবসর সময়ে সস্তায় ভাল জিনিষ তৈরী কর্‌তে পারে, আর সমবায়ের সাহায্যে তার উপযুক্ত দামে বিক্রির ব্যবস্থা কর্‌তে পারে তা হলে যে তা ভাগ্য ফিরে যাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

প্লিনি ইত্যাদির অনেক পরে বার্ণিয়ারের ভ্রমণ বৃত্তান্তে আমরা জান্‌তে পারি যে—সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলায় রেশম শিল্প খুব জোর চল্‌তো। তিনি লিখে গেছেন যে বাংলায় এত বেশী সিল্ক হয়—যে এটাকে কেবল ভারতবর্ষের বা মোগল সাম্রাজ্যের সিল্কের ভাণ্ডার বলা যেতে পারে তা নয়—পাশাপাশি অন্য সমস্ত রাজ্য এমন কি ইউরোপের রেশম পর্য্যন্ত এই বাংলা দেশ হতে যায়। ডাচদের কাশিমবাজারে যে কুটী ছিল সেখানে ৭০০।৮০০ লোক সিল্কের কাজ কর্‌তো।

তারপরে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীও কাশিমবাজারে কুঠী করেছিলেন, সেখানে প্রত্যেক বছর ১৪০,০০০ পাউণ্ড (১ পাউণ্ড=১৩ টাকা) দামের সিল্ক তৈরী হত।

কিন্তু ১৮৫০ সালের পর থেকে এই রেশমের ব্যবসার অবনতি সুরু হয়। ক্রমশঃ ক্রমশঃ এর অবনতি হতে হতে এখন এ শিল্প খুব সামান্য ভাবে চল্‌ছে। এখনও এ

শিল্প একেবারে মরেনি বটে, কিন্তু দেশ বিদেশে এর প্রচলন দূরে থাক্, এক ভারতবর্ষেই এর চলন কমে আস্‌ছে; মুর্শিদাবাদের রেশম দেখ্‌তে ভাল নয় বা মজবুত হয় না—এ বলে যে তার প্রচলন কমে আস্‌ছে তা নয়—এর চলন কমার প্রধান কারণ হচ্ছে কম দামে অন্য সিল্ক চলতে আরম্ভ করেছে। এখন এ শিল্পের উন্নতি কর্‌তে হলে যাতে কমদামে রেশম তৈরী কর্‌তে পারা যায়—আর সেই রেশম যাতে ঠিকমতো বাজারে উপস্থিত হতে পারে সেই দিকেই বেশী খেয়াল রাখ্‌তে হবে।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ দুরকম পলুর চাষ হয়—এক ঘরের ভিতর আর বাইরে। ঘরের ভিতর এক জাতের পলুকে ডালার ভিতর রেখে দেওয়া হয়। আর বাইরের যে পলু তাকে গাছের উপর রেখে দেওয়া হয়। যে সব পলু ঘরের বাইরে চাষ করা হয়, তাদের বিশেষ কোন ব্যায়রাম হয় না। আর যে সব পলু ঘরের ভিতর চাষ করা হয়, তাদের সাধারণতঃ নানারকম অসুখ দেখতে পাওয়া যায়। এসব অসুখ যে কেন হয় আর তার নিবারণের উপায় কি এসব স্থির করার জন্য বড়ো বড়ো গবেষণাগার দরকার। অবশ্য এদিকে সরকারের নজর পড়েছে আর তারই প্রথম চিহ্নস্বরূপ বহরমপুরে একটী রেশমের উন্নতির জন্য গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সে হ'ল বড় কথা,—চাষীরা যেটা এই মুহূর্ত্তেই করতে পারে—সে কথা বল্‌তে গেলে

বল্‌তে হবে চাষীদের এমন কয়েক জাতের ঘরের পলুর চাষ করা যাদের ব্যায়রাম কম হয়। এই রকম জাতের পলুর মধ্যে ছোট আর নিস্তারি জাতের পলুই প্রধান। কাজেই চাষীদের এখন উচিত হচ্ছে শীতকালে একটী বেশী লাভের পলুর চাষ করা। কার্ত্তিক মাসে ছোট পলুর চাষ করা, আর চৈত্র থেকে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত নিস্তারি পলু চাষ করা,—এ হলে তারা যে অনেক বেশী রেশম পাবে—এটা আশা করা যায়।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ দেখা যায় যে পলু চারধারে রেশমের গুটী বাঁধলে তাকে গরম জলে ফেলে মারা হয়। এ প্রণালীটা অবশ্য বহুদিন থেকেই আমাদের দেশে চলে আস্‌ছে। কিন্তু জাপানে এর চেয়েও আর একটা উন্নত প্রণালী বেরিয়েছে। সেখানে একটা পলু থেকে দুবার রেশম বার করা হয়। প্রথমে তাকে খুব ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে একবার রেশম বার করে নেওয়া হয় আর দ্বিতীয়বার তাকে গরম জলে ডুবিয়ে শেষ বারের মতো রেশম নেওয়া হয়। এই রকমে আমাদের দেশে যেখানে কেবল একবার মাত্র রেশম পাওয়া যায়—জাপানে সেখানে দুবার রেশম পাওয়া যায়। অবশ্য জিনিষটা এতই সোজা নয়। এর মধ্যে কায়দা অনেক রকম আছে। কিন্তু যাই হোক্ জিনিষটা মোটামুটি এই প্রণালী আমাদের দেশে চল্‌তে পারে বলে মনে হয়। আর এরকমভাবে বেশী রেশম পেলে যে এদেশে রেশম শিল্পের উন্নতি হবে—সেটা আশা করা যায়।

এ সব ছাড়া রেশমের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হচ্ছে বিক্রির মাল ঠিক সময়ে উপযুক্ত বাজারে নিয়ে এসে বিক্রি করার সমস্যা। ঠিকভাবে বাজারে না আন্‌তে পারায়, রেশম ব্যবসা যে কতোটা পিছিয়ে আছে তা বলা যায় না; এ সম্বন্ধে একবার একটী চমৎকার ঘটনা ঘটেছিল—সেটা এখানে উল্লেখযোগ্য। ১৯১৫ সালে বাংলার আইন সভায় মিঃ বীটসন বেল একটী সিল্কের রুমাল দেখিয়ে বল্‌লেন যে লর্ড কার্‌মাইকেল এডিনবর্গ থেকে এই ধরনের রুমাল কিন্‌তেন। তাঁকে বলা হয়েছিল যে এ ধরনের রুমাল ভারতবর্ষ থেকে আসে। তারপর তিনি যখন মাদ্রাজের লাট হয়ে এলেন তখন সব সিল্কের দোকানে লোক পাঠিয়ে জান্‌লেন যে এ রকম ধরনের রুমাল কোথায় তৈরী হয়। তাতে তিনি শুন্‌লেন যে সে রুমাল বাংলায় হয়। তারপর তিনি যখন বাংলার লাট হলেন, তখন কল্‌কাতায় রেশম ব্যবসায়ীদের কাছে খোঁজ কর্‌লেন যে এ রকম রুমাল কোথায় হয়। তারা বল্‌লে যে বোধ হয় এ ধরনের রুমাল বোম্বাইএ হয়। বোম্বায়ে খোঁজ করতে জানা গেল যে সে রুমাল নাকি বর্ম্মায় হয়। বর্ম্মায় খোঁজ করে টের পাওয়া গেল সেগুলো নাকি জাপান থেকে আসে। তারপর লাট সাহেব সরকারের শিল্প বিভাগে রুমালখানি পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করে পাঠাতে শিল্পবিভাগের 'বিশেষ-অজ্ঞরা' "অনেক চিন্তার পর" উত্তর দিলেন যে সে রুমাল ভারতে হয়ই না

ফ্রান্স দেশে বোধ হয় তৈরী হয়। শেষে কিছু ঠিক্ করতে না পেরে এডিনবার্গে সেই দোকানে জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল যে সে গুলো মুর্শিদাবাদে হয়! এই হতেই আমাদের রেশম ব্যবসার দুরবস্থার কথা বোঝা যায়।

সেই জন্যে রেশম শিল্পের উন্নতি করতে হলে, যাতে রেশম ঠিক মতো বাজারে পৌঁছায় তার ব্যবস্থা কর্‌া দরকার। লর্ড কারমাইকেলও সেই জন্যে বলেছিলেন যে মুর্শিদাবাদের রেশম ব্যবসায়ীদের একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া উচিত যাতে তাদের জিনিষ কলিকাতা আস্‌তে পারে। সেইগুলো কল্‌কাতায় এলে তার চাহিদাও বেশী হবে—আর চাহিদা হলেই রেশম কারিকরদেরও কাজ করার উৎসাহ বাড়বে—এক কথায় শিল্পের উন্নতি হবে। সেই জন্য রেশম শিল্পের উন্নতি কর্‌তে হলে ওদিকেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার দরকার হয়ে পড়েছে। মোটামুটী এই সব উপায়গুলি অবলম্বন কর্‌লেই রেশম শিল্পের উন্নতি হবে বলে মনে হয়।

এর পরে হচ্ছে সূতো জড়ানোর সমস্যা। আমাদের বাংলার পল্লীতে যাদের হাতে এখন রেশম শিল্প রয়েছে তারা এমনভাবে সূতো জড়ায় যে তাতে অনেক সূতো নষ্ট হয়। এ বিষয় রেশম কারিকরদের শেখাবার জন্য সরকার বহরমপুর ও মালদহে রেশমী সূতো জড়ানোর উন্নত প্রণালী দেখিয়েছেন। যদি বাংলায় রেশম-কারিকরেরা এটা ঠিকমত অনুকরণ করতে

পারে তাহলে তাদের যে খানিকটা উন্নতি হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

চাষীরা ভাল ভাবে রেশম রং কর্‌তে পারেনা আর তার ফলে তাদের জিনিষ দেখ্‌তে ভাল হয় না—আর তাদের জিনিষের চাহিদাও কমে যায়। সেইজন্য রেশমের চলন বাড়াতে হলে যাতে রেশমে ঠিক মত রং হয় সে দিকে খেয়াল রাখা উচিত। সরকার পক্ষ হতে চাষীদের রং করা শেখানো আরম্ভ হয়েছে। ফরিদপুর আর বর্দ্ধমান জেলাতেই এ প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। ক্রমশঃ ক্রমশঃ এ চেষ্টা যে বীরভূম মুর্শিদাবাদ (যেখানে রেশমের চাষ হয় ও রেশম বোনা হয়) প্রভৃতি জেলাতেও আরম্ভ হবে তা' আশা কর্‌তে পারা যায়। রেশমে এখনও চিরাচরিত ধরনের জিনিষ ছাড়া নূতন জিনিষ বোন্‌বার দিকে খেয়াল আসেনি। যেমন কেবল চাদর বা জামার থান, বা কাপড় না বুনে যদি মুর্শিদাবাদের রেশম কারিগরেরা বেশ ফ্যান্সি ধরনের রুমাল বা এই রকম জিনিষ বুন্‌তে আরম্ভ করে, তা হলে তাদের লাভ হবার আশা করা যায়।

পাটবোনা।

সূতো ও রেশম বোনার সঙ্গে সঙ্গে পাট বোনার কথাও একটু বলা উচিত। সাধারণতঃ আমাদের দেশে বেশী পাট বোনা হয় না—পাট কেবল বিদেশে চালানই যায়। তবু পাট বোনা যে একেবারে নেই তা নয়। আগে দিনাজপুরে কাপালি

বলে একটা জাত পাট বুন্‌ত। তারা সেই পাট বুনে নানা রকম জিনিষ তৈরী কর্‌তো, আর সেই সব জিনিষ বিক্রি হ'ত বেশীভাগ বোম্বাইয়ে। এখন ক্রমশঃ ক্রমশঃ এই পাট বোনার অবনতি হলেও এটা এখনো একেবারে লুপ্ত হয় নি। ১৯৩১ সালের সেন্সাস হতে জানা যায় যে এখনও আনুমানিক ১৭১,০২৮ জন লোক এই পাট বোনার কাজে নিযুক্ত আছে।

এর খানিকটা উন্নতি বাংলায় খুব সহজেই হতে পারে। প্রথমতঃ পাট বোনার তাঁত হচ্ছে সেই পুরাণ ধরণের তাঁত। কিন্তু ঠক্‌ঠকি তাঁতেও পাট বেশ ভাল বোনা চল্‌তে পারে। তাতে বেশী কাজ হ্‌বার আশা করা যায়। তারপর যে জিনিষ বাজারে বেশী বিক্রি হবে কেবল সেই সব জিনিষের দিকেই লক্ষ্য দেওয়া উচিত। যেমন পাট থেকে নরম কার্পেট, সতরঞ্চ ইত্যাদি জিনিষ তৈরী করতে পার্‌লে বাজারে খুব বিক্রি হবে। কাজেই এখন এই সব দিকে পাট বোনার চেষ্টা কর্‌লে পাট বোনার যথেষ্ট উন্নতি আশা করা যায়—আর এতে রেশমের মতো না হলেও যে প্রচুর লাভ আছে—তা বোধ হয় অনেকেই জানেন। যেখানে পাট চাষ হয় সেখানে সেখানে এই পাট চাষের সঙ্গে পাট বোনার চেষ্টা কর্‌লে চাষীদের উপর হতে পারে বলে মনে হয়।

গুড় তৈয়ারী ও চিনি তৈয়ারী।

আমাদের দেশে মন্দ আখ হয় না। সমস্ত বাংলাদেশে

আখ হয় প্রায় ২০০,৮০০ একরে। কিন্তু আমাদের দেশে এ আখের ঠিক ব্যবহার হয় না। কিছু কিছু আখ কলে পিষে চিনি হয় কিছু গুড় হয়—আর বাকী সব কায়দা না জানার জন্য নষ্ট হয়। সত্যি কথা বল্‌তে গেলে আখ সম্বন্ধে আমাদের কোন ভালমতো ব্যবস্থাই নাই—সেই জন্যে আখ থেকে আমাদের যে রকম লাভ হওয়া উচিত আমরা তার অতি সামান্য অংশই পেয়ে থাকি।

কিন্তু ভারতবর্ষেই একদিন জগতের সব চেয়ে বেশী আখ চাষ হতো। ১৮৯৫-৯৯ সালে দেখতে পাওয়া যায় যে ভারতবর্ষ সমস্ত জগতের অর্দ্ধেক আখ চাষ করতো। কিন্তু ১৯২০ সালে ভারতে জগতের সমস্ত আখের মাত্র শতকরা ২০ ভাগ আখ চাষ করেছিল। আর সে আখ চাষ যে কতদূর অনুন্নতভাবে হয়েছিল তাও বোঝা যায় যখন হিসেব করে দেখা যায় যে ১৯২০ সালে জগতে যত জমিতে আখ চাষ হয় তার অর্দ্ধেক জমিতে (৩০ লাখ একর) আখ চাষ করে মাত্র শতকরা ২০ ভাগ ফসল পাওয়া গেল।

এই হতেই বোঝা যায় যে ভারতবর্ষে বিঘা প্রতি আখ খুব কম হয়। একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে—বিঘা প্রতি কিউবার যা ফসল হয় ভারতবর্ষে তার একের তিনভাগ, আর বিঘা প্রতি জাভায় যা ফসল হয়, ভারতবর্ষে তার ছয়ভাগ ফসল হয়। এই হতেই বোঝা যায়—যে কিউবায় বিঘা প্রতি তিনগুণ আর

জাভায় ছ' গুণ ফসল হওয়ার জন্য সেখানে মোট জমি ভারতবর্ষের চেয়ে অল্প হলেও, তারা নিজেদের অভাব পূরণ করে, বিদেশে চালান দিতে পারছে। ১৯৩২-৩৩ সালে ৮৬০০০ টন চিনি বাংলায় আমদানী হয়েছিল। তারমধ্যে শতকরা ২৯ ভাগ চিনি কেবল মাত্র জাভা থেকে এসেছিল।

জাভায় চিনির ব্যবসার এতো উন্নতির অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ তারা যা চিনি তৈরী করে, তা খুব বেশী পরিমাণে করে। আখ ক্ষেতের কাছাকাছি সব বড়ো বড়ো ফ্যাক্‌টরীর প্রণালী এতো উন্নত যে তাতে একটু জিনিষও নষ্ট হয় না। আর সব চেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে যে জাভার চিনি ব্যবসায়ীরা একটা সমবায় করে চিনির বাজারে নিজেদের হাতে রেখে দিয়েছে।

কিন্তু বাংলায় এরকম ধরনে চিনির কারবার চলা অসম্ভব নয়। কিন্তু তা'দূরের কথা। এখন বাংলার এসব বড়ো বড়ো ফ্যাক্‌টরীর কথা দূরে থাক্, কি করে ভাল আখ মাড়াই কল চালাতে পারা যায়, সেইটেই একটা মস্ত সমস্যার কথা। কাজেই আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় বাংলা হতে দেশ বিদেশে চিনি চালান দেওয়ার কল্পনা ছেড়ে, যাতে বাংলার অভাব কেবল বাংলা হতেই মেটে, সেই দিকেই দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এটা চালাতে গেলে আমাদের কয়েকটা জিনিষের দিকে খেয়াল রাখা দরকার।

প্রথমতঃ আমাদের এমন আখ লাগানো চাই, যার বিঘা

প্রতি ফলন খুব বেশী, আর যা থেকে রসও বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। এর জন্য বাংলার মাটিতে কইম্বাটোর আখ হচ্ছে সব চেয়ে ভাল। এর বিঘা প্রতি ফলন হচ্ছে প্রায় ২০০।২৫০ মণ করে। আর বাংলার মাটীতে এ আখ প্রায় নষ্ট হয় না। সেইজন্য যাতে এখন অন্যান্য কম লাভজনক আখের চাষ না হয়ে কইম্বাটোর আখের চাষই বেশী পরিমাণে চলে, সে বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত। চাষের কথার মধ্যে এ কথা অনেকবার বলা হয়েছে।

তারপর হচ্ছে আখ কাটাই মাড়াই থেকে গুড় বা চিনি করাব ব্যাপার। আমাদের দেশে তখন আখ মাড়াই সাধারণতঃ বড় অনুন্নত উপায়ে হয়। আখের যে মাড়াই কল সাধারণতঃ বাংলায় চলে, সেটা হচ্ছে দুটো রোলার দিয়ে তৈরী—বলদে চলে। কিন্তু তাতে রস বেশী পরিমাণে বার হয় না। আজ কাল অনেক রকমের কেনক্রাশার বা আখ মাড়াই কল বেরিয়েছে যাতে পুরোনো ধরনের কলের চেয়ে অনেক পরিমাণে বেশী রস পাওয়া যায। বলদে টানা রেন্‌উইক্ সাহেবের কল তার মধ্যে একটা। এই খানে একটা কথা বলা উচিত। এটা অনেকে জানেন যে পাক্‌বার অনেক আগে বা অনেক পরে আখ কাট্‌লে গুড় কম হয়, আবার আখ কাট্‌বার সঙ্গে সঙ্গে পেড়াই না হলে রস কমে যায়। আবার পেড়ায়ের পর যতো তাড়াতাড়ি রস জ্বাল দেওয়া যায় ততোই ভাল।

আমাদের দেশে রস জ্বাল দেওয়া প্রভৃতির প্রণালী এত অনুন্নত যে তাতে অনেক সময় লোক্‌সান হয়। অনেকেই হয়তো ঠিক প্রণালীটা জানেন না বা আখের ছিব্‌ড়ে গুলিকে ঠিক্‌ মতো কাজে লাগাতে পারেন না। আমাদের একটা কথা মনে আছে। একবারে আমাদের বাগানে খুব আখ হয়েছিল। খুব উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে সেই আখ পিড়িয়ে মণ মণ কাঠ পুড়িয়ে গুড় তৈরী করা হল। গুড় হল বটে, কিন্তু শেষকালে হিসেব করে দেখা গেল যে কাঠের যা দাম পড়েছে তাতে যে গুড় হয়েছে তার তিনগুণ গুড় বাজার হতে কিনে নিয়ে আসা সম্ভব হত। কিন্তু যারা আখের ব্যবসায় করে জীবিকা চালাবে, তাদের এ লোক্‌সান দেওয়া সম্ভব নয়। অনেকে হয়তো বিশ্বাস কর্‌বেন না কিন্তু বহু জায়গায় বিশেষতঃ সরকারী ফারমে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে প্রথম দুই এক দিন যাওয়ার পরেই আখের ছিব্‌ড়েতেই জ্বালানি হতে পারে অনেকে এপর্য্যন্ত বলেন যে মাত্র ২।১ মণ কাঠ জ্বালানর পর হতেই আখের ছিব্‌ড়ে চল্‌তে পারে।

এই রস জ্বাল দেওয়ার জন্য সরকারী ফার্মে'রা দু তিন রকমের চুলো বার করেছেন। তাতে রসটী খুব শীঘ্র খুব ভাল পাক হয়। তাতে পাশাপাশি দুটো চুলো আছে তার মধ্যে দুটো থাক্‌ আছে। নীচের থাকে আগুন জ্বলে, উপর থাক দিয়ে ধোঁয়া যাবার রাস্তা আছে। তার পর সেই দুটো চুলোর ধোঁয়া

একত্রিত হয়ে একটী কাদার চিম্‌নি দিয়ে বেরিয়ে যায়। জিনিষটা লিখ্‌তে বড়ো বলে মনে হয়, কিন্তু জিনিষটা মোটেই শক্ত নয়। কেবল মাত্র কাদার চুলো একটু কায়দা করে তৈরী, সরকারী ফার্মে গেলে অথবা চিঠি লিখ্‌লে তাঁরা এটা খুব ভাল ভাবে বুঝিয়ে দেন। এই ধরণের একটা চুলোর নাম হচ্ছে "মার্শম্যান সাহেবের চুলা"।

এখন মোটামুটি এই সব জিনিষ গুলো অবলম্বন করলেই গুড়ের অনেক উন্নতি হতে পারে বলে মনে হয়। এ ছাড়া ও আখের চাষে কাটাই, মাড়াই, রস জ্বাল ইত্যাতি ব্যাপারে অনেক ছোট বড়ো জিনিষের দিকে লক্ষ্য না রাখ্‌তে পার্‌লে, গুড়ের পরিপূর্ণ উন্নতি হবে না, কিন্তু প্রথমে প্রধান প্রধান কয়েকটা ব্যাপারের উন্নতি কর্‌তে পারলেই গুড়ের অনেক উন্নতি হবে।

গুড় তৈরী ব্যবসায় গ্রামের অনেক লোকের অনেক উপকার হওয়ার সম্ভব রয়েছে। যদি চাষী নিজের জমিতে দুবার বা তিনবার ফসল তুলতে ব্যস্ত থাকে তা হলে হয়তো গুড় তৈরী করার জন্য তার সময় হবে না। সে অবস্থায় যে সব চাষীরা একটার বেশী ফসল কর্‌তে পারে না তারা এই গুড় তৈরী করে অবসর সময়ে অনেক লাভ পেতে পারে। আর তা ছাড়া আরো বল্‌তে পারা যায় যে হয়তো কোন অবস্থাপন্ন চাষী একা বা কয়েকজন মিলে সমবায় করে একটা ভাল আখ মাড়াই কল বা

গোটা কয়েক রস জ্বাল দেওয়ার ভাল কড়া (হাদ্রী সাহেবের কড়া) কিন্‌লে। তারপর সে সেই সব জিনিষ অন্যান্য চাষীদের ভাড়া দিয়ে কিছু লাভ পেতে পারে। এতে একসঙ্গে দুরকম উপকার হবে। প্রথমতঃ যার জিনিষ সে তো কিছু লাভ পাবেই, আর দ্বিতীয়—গ্রামের মধ্যে চাষীরা এই সব উন্নত ধরণের জিনিষ-পত্রের ব্যবহার জান্‌তে পারবে, তাতে কি রকম লাভ হয় তা জান্‌তে পারবে আর তারাও সুবিধে পেলেই সেই সব উন্নত ধরণের জিনিষ দিয়ে বেশী গুড় তৈরী করে লাভবান হবার চেষ্টা করবে। এই রকম করে সমস্ত আখ চাষ ও গুড় তৈরীর উন্নতি হতে পারে—এরকমও আশা করা যায়।

কিন্তু গুড়টা যতো সহজে হয়, আর এটা চাষীদের যাতে যেমন ভাল ভাবে চল্‌তে পারে, চিনিটা ততো সহজে চলা সম্ভব নয়। সাধারণতঃ চিনিটা কল না হলে হয় না, তবে দু এক রকম উপায়ে চিনিটাও অনেকটা সহজে বিনাকলে করা সম্ভব। যেমন তার মধ্যে একটা কথা বল্‌ছি।

পরিশিষ্ট 'চ' তে প্রদত্ত ছবির মত আখ জ্বাল দেওয়ার উনুন করতে হবে। তারপর উনুনে রস দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। আখের রস যখন বেশ ফুটতে আরম্ভ করবে। তখন অতি সামান্য পরিমাণে সাইট্রিক অ্যাসিড ফেলে দিলে প্রচুর গাদ উঠবে। তখন সেই গাদ ঝান্নায় করে তুলে ফেলে দিয়ে সেই গুড় বেশ ভাল করে জ্বাল দিতে দিতে যখন বেশ একটু ঘন হয়ে আস্‌বে তখন

তাকে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা করতে হবে। তারপর তাকে ভেঙে গুঁড়ো করে দিয়ে ক্রমশঃ ক্রমশঃ পাটালি বা ভেলী গুড় করার মতো তাকে তৈরী করতে হবে। কিন্তু ঐ সাইট্রিক অ্যাসিড দেওয়ায় সে জিনিষটা গুড় না হয়ে চিনির মতো ফর্সা ও দানাদার হবে—সামান্য একটু লালচে আভা থাকবে এই মাত্র। ইংরেজীতে একে বলে **Semi-brown sugar.** এই প্রণালী ছাড়া শেওলা দিয়ে চিনি করার উপায় অনেকের কাছেই পরিচিত বলে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

কাঁসা।

এ পর্য্যন্ত চাষের সঙ্গে খুব নিকট সম্বন্ধযুক্ত যে সব জিনিষ কুটীর শিল্পে আসতে পারে, সেই সব জিনিষের আলোচনা করা হয়েছে। এইবার চাষের থেকে ভিন্ন কুটীর শিল্পের কথা আলোচনা করা হবে।

এরকম ধরণের কুটীর শিল্পের মধ্যে সব প্রধান হচ্ছে পিতল কাঁসার ব্যবসা। হিসেব করে দেখা গেছে যে তাঁত বোনার পরেই এই পিতল কাঁসার ব্যবসায়ের জায়গা। বহু বছর হতে এই ব্যবসা বহু লোকের জীবিকা হয়ে রয়েছে। আমাদের দেশে এই বড় বড় জালা হতে আরম্ভ করে ছোট ছোট থালা বাটী পর্য্যন্ত সমস্ত জিনিষেই পিতল কাঁসার ব্যবসা এখনও পর্য্যন্ত টিকে রয়েছে আর এখনও এর থেকে অনেক লোক তাদের সংসার চালাচ্ছে। ১৯৩১ সালের সেন্‌সাস হতে জানা যায় যে এখনও মোট ১৩,৮৫৩

জন লোক পিতল কাঁসার ব্যবসা থেকে জীবিকা উপার্জ্জন কর্‌ছে।

এখনও অনেক জায়গায় ভাল পিতলের ব্যবসা রয়েছে। বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে ডাঁইহাট, বেগুনকোলা, পূর্ব্বস্থলী, চুপি, জাবুই, সহেরাবাজার, দিক্‌নগর, কৈতারা, বৌপাস, করমপুর এই ক'টা জায়গাতেই পিতল কাঁসার ব্যবসা ভাল রকম চলে। বীরভূম জেলার মধ্যে নলহাটী ও দুবরাজপুরে এ ব্যবসা চল্‌ছে। বাঁকুড়া পাত্রসায়রে প্রায় ২০০ কাঁসারি এই ব্যবসায়ে রয়েছে। বিষ্ণুপুরেও প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে অন্ততঃ তিনজন এই ব্যবসায়ে আছে এমন ২০০ পরিবার আছে। হুগলি জেলায় ঘোলসরায়, বাঁশবেড়ে, বালী ও দেওয়ানগঞ্জে এ ব্যবসা চলে। ঘোলসরায় প্রায় ৩৭ ঘর কাঁসারির বাসা। বালী ও দেওয়ানগঞ্জ প্রায়—৩০০ ঘর কাঁসারি ও কয়েক ঘর দুলে বাগদী পিতল কাঁসার কাজে লেগে রয়েছে। হাওড়া জেলার মধ্যে কল্যাণপুরে আর চব্বিশ পরগণায় বসিরহাট ও বাদুরিয়ায় পিতল কাঁসার জিনিষ খুব হয়। এ ছাড়া মতিহারী নবদ্বীপ, সাধনপাড়া, মেহেরপুর বাহিরগাছি, সরক, রানাঘাট ও ফরিদপুর এ কয়টা জায়গা থেকেও প্রচুর বাসন তৈরী হয়। দেখা গিয়াছে যে কেবল মতিহারি ও নবদ্বীপেই প্রায় ২৫০০০ মন বাসন বছরে তৈরী হয়। ঢাকাতেও ব্রাহ্মণগাঁ ধানকুড়িয়া, লোহাগঞ্জ, ফিরিঙ্গিবাজার, আবদুল্লাপুর, সোলানগড়, ধামড়াই এবং ময়মনসিংহ জেলায় ইসলামপুরে বহু জিনিষ তৈরী হয়। সরকারের এক রিপোর্টে দেখা যায় যে কাগমারী ও মগরা

হতে বছরে প্রায় ৫০০০০ হতে ১০০০০০০ টাকার পিতলের জিনিষ রপ্তানি হয়। কিন্তু পিতল কাঁসায় সব চেয়ে বড়ো কেন্দ্র হচ্ছে মুর্শিদাবাদ জেলার খাগড়া।

এখন পর্য্যন্ত বাংলায় যা পিতল কাঁসার ব্যবসা চল্‌ছে তা প্রায় সমস্তই বাসন তৈরী করার দিকেই লক্ষ্য থাকে। বাংলায় এত টাকার পিতল কাঁসার জিনিষ তৈরী হলেও, সবই প্রায় বাসন তৈরী হয়। সেজন্য যখন সস্তা আলুমিনিয়াম বাসন চল্‌তে আরম্ভ কর্‌ল, তখন হতেই পিতল কাঁসার ব্যবসার মন্দা পড়তে সুরু হ'ল। তারপর ক্রমশঃ ক্রমশঃ যতো আলুমিনিয়াম বাসন বাড়তে লাগল, কাঁসা পিতলের বাসন ততো কমে যেতে লাগ্‌ল। সেই জন্য এখনও বড়ো ব্যবসা থাকলেও পিতল কাঁসার ব্যবসা আগের চেয়ে অনেক কমে গিয়েছে। সেই জন্য যাতে পিতলের ব্যবসা বাড়ে, তার দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। কারণ এ ব্যবসাটী যদি বাড়ে, তা হলে অনেক ভদ্রলোকও ব্যবসায় যেতে পারেন। এ ব্যবসা বাড়াতে হলে কেবল মাত্র বাসন তৈরী কর্‌লে চল্‌বে না।

দেখা যায় প্রতি বছর পিতলের কব্জা প্রভৃতি বাড়ীর সরঞ্জাম, দরজার হাতল, কাগজ চাপা, প্রভৃতি প্রতি বছর বিদেশ হতে আমদানি হয়। ১৯৩২-৩৪ সালেও ১ কোটি ৩৮ লাখ টাকার পিতলের জিনিষ জার্ম্মানি ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশ হতে আমদানি হয়েছে।

আমাদের বাংলার কাঁসারিরা ও পিতল ব্যবসায়ীরা যদি ঐ রকম দরজার হাতল কব্জা, কাগজ চাপা, বড়ো বড়ো ইলেক্‌ট্রিক লাইট টাঙাবার চেন ইত্যাদি জিনিষ তৈরী করার দিকে লক্ষ্য রাখে, তা হলে এই ১ কোটী ৩৮ লাখ টাকা না হোক্ অন্ততঃ তার অনেকটা এই সব কাঁসারিরাই পাবে। আর এদেশী ব্যবসায়ীরা যে এসব জিনিষে ও দেশের জিনিষের সঙ্গে পেরে উঠবে না এ রকম মনে হয় না। কারণ আমাদের দেশেও পিতল কাঁসার উন্নতি কম হয় নি। যখন খাগড়ার বাসনের চমৎকার পালিশ আমাদের নজরে পড়ে তখন আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না যে এদেশের লোকেরা বাজারে ঠেলে উঠতে পারবে না।

আর এ ব্যবসাটা এমন কিছু শক্ত নয়। বাংলার চাষীরা যদি ইচ্ছে করে, তবে অনায়াসে এ ব্যবসা শিখে নিতে পারে। আর এতে যে খুব বেশী টাকার দরকার তাও নয়। যদি ঠিক কুটীর শিল্পের ধরণে এটাকে চালানো হয় তা হলে এটা দু'একশো টাকাতেই বেশ ভাল রকম হওয়া সম্ভব। সে টাকা সমবায় সমিতি থেকে জোগার করা অসম্ভব নয়।

এই পিতল কাঁসার ব্যবসা মেদিনীপুর জেলায় কাহারে একটু অন্যরকম ভাবে চলে। সেখানে প্রায় ১০০ জন মহাজন রয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা দোকান রয়েছে। কোন কোন দোকানে ৭০।৮০ জন লোক পর্য্যন্ত কাজ করে। মহাজনেরা কাঁসারিদের কাঁচা মাল দিয়ে পরে তৈরী

জিনিষ দিয়ে যান। কাঁসারিরা একটা বানি পায়। অবশ্য এ হতে অনেক খারাপ জিনিষের উদ্ভব হয় নি' এমন নয়। তবে মোটের উপর যে প্রণালীটা রয়েছে, সেটাকে একটু ভাঙা চোরা করে নিলে ব্যবসার অনেক উন্নতি করা চল্‌তে পারে। এখন যেখানে কাঁসারিদের জিনিষপত্র ঠিকমতো বাজারে না আনায় তারা ভাল দাম পায় না, সেই সব জায়গায় ভদ্রলোকেরা কিছু টাকা নিয়ে মহাজনদের যায়গায় বস্‌তে পারলে এ ব্যবসার অনেক উন্নতির সম্ভাবনা আছে। আর এই দিকেই সরকারও বেশী ঝোঁক দিয়েছেন। তাঁরা সব ছোট ছোট ফ্যাক্‌টারী স্থাপন করেছেন। তাতে প্রথমে ৭০০৲ টাকা ৮০০৲ টাকা ও চালাবার খরচ মাসে ৯০০৲ টাকা করে পড়বে, কিন্তু খাঁটী লাভ থাক্‌বে মাসে ১৬৫৲। এর বিস্তৃত বিবরণ পরিশিষ্ট 'ঙ' তে দেওয়া হল।

এ রকম ধরণে পিতল কাঁসার ব্যবসা চালাতে পার্‌লে আর তার সঙ্গে সমবায় সমিতি করেই হোক্ বা অন্য উপায়েই হোক্ সেটাকে ঠিকমত বাজারে আন্‌তে পার্‌লে এ হতে অনেক লাভ হবার সম্ভাবনা।

আর এ ব্যবসাটা এ রকম ধরণের যে চাষী ত বটেই এমন কি ভদ্রলোকেরাও এ হতে জীবিকা অর্জ্জন করতে পারেন। কাজেই এটাকে আমাদের অবহেলা না করে যাতে এর উন্নতি হয় সে জন্য চেষ্টা করা উচিত।

অপর কয়েকটী কুটীর শিল্প।

চাষের সঙ্গে সঙ্গে চল্‌তে পারে এ রকম কুটীর শিল্প আরও কয়েকটী আছে। এখানে সেইগুলি সম্বন্ধে কিছু কিছু বলা হচ্ছে।

১। ফল সংরক্ষণ

বিলেত প্রভৃতি দেশে চিনির রস বা অন্য রকম প্রক্রিয়ায় ফল বহুদিন পর্য্যন্ত তাজা রেখে দেওয়া হয়। এসব জিনিষ দেশ বিদেশে চালান যায় আর তা হতে প্রচুর আয় হয়। বাংলা দেশেও এটা করা এমন কিছু শক্ত নয়। সাধারণতঃ চিনির রসে ফেলে ফলটাকে বহুদিন ভাল রাখা হয়। এ সম্বন্ধে যারা বিশেষভাবে জান্‌তে চান, তাঁরা এ সম্বন্ধে বই পড়লেই জান্‌তে পারবেন।

কৃষ্ণনগরে এরকম প্রচেষ্টা চল্‌ছে। সেখানে সরকার একটা বাগান করে এরকম চেষ্টা করেছেন।

এই ফল ভাল রাখার সঙ্গে সঙ্গে আচার মোরব্বা প্রভৃতি জিনিষের দিকে কিছু নজর দেওয়াও উচিত বলে মনে হয়। এসব জিনিষ বেশ গুছিয়ে বাজারে চালাতে পারলে লাভ হবে বলে মনে হয়। এই সঙ্গে পেপিন তৈরীর কথাটা বলা উচিত। বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রভৃতি ঔষধের কার্‌খানায় ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার ঔষধ তৈরী করার জন্য পেঁপে হতে তৈরী পেপিন প্রচুর পরিমাণে লাগে। পেঁপের বড়ো ফল পেতে হ'লে ছোট ফলগুলি ভেঙে

দিতে হয়। সেগুলি ভেঙে দেওয়ার আগে সেগুলির গায়ে বাঁশের বাখারি দিয়ে চিরে দিয়ে একটী কাঁচের গেলাসে বা পাথর বাটীতে সেই আঠা সংগ্রহ করে শুকিয়ে নিতে হবে। আঠা সংগ্রহ করে সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে নিতে হয় কারণ তা না হলে আঠা পচে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। তারপর রেক্‌টিফায়েড স্পিরিটে আঠা ধুয়ে পরিষ্কার করে শুকিয়ে নিলেই পেপিন হয়ে গেল।

মাদ্রাজে একরকম পেপিনের ট্যাবলেট তৈরী হয়। আঠা সংগ্রহ কর্‌বার সময় আঠা ধর্‌বার পাত্রের উপর পরিষ্কার চিনি রেখে তার উপর আঠার ফোঁটাগুলি আলাদা ভাবে ফেল্‌তে পার্‌লেই আপনা-আপনি এক একটী ট্যাবলেট তৈরী হয়ে যায়।

২। বাঁশ বা বেত হতে বাক্স তৈরী করা

আমাদের দেশে এসব জিনিষ বহুদিন থেকে চলে আসছে। তবে চাষীরা সাধারণতঃ এসব কাজ করে না। কিন্তু এসব কাজ করার অসম্মান কোন খানে বুঝি না।

যাই হোক্ যদি চাষীরা অবসর সময়ে বেত বা বাঁশ হতে প্যাট্‌রা বসবার মোড়া প্রভৃতি তৈয়ারী করে আর সে সব জিনিষ যদি কোন সমবায়ের হাত দিয়ে কোন বড় সহরে এনে বিক্রি করতে পারে, তা হলে তাদের প্রচুর আয় হবার সম্ভাবনা রয়েছে। দেখা গিয়াছে কোন কোন অন্ধ বিদ্যালয়ে এই সব জিনিষ শিখিয়ে দিয়ে তারপর এই সব জিনিষ বিক্রি করা টাকা

হতে বেশ লাভ করে। কাজেই চাষীরা যদি অবসর সময়ে চেয়ার, মোড়া প্রভৃতি তৈরী করে, তাহলে আশা করা যায় যে তার থেকে তারা বেশ লাভ পাবে।

৩। শোলা

বাংলা দেশে শোলার ব্যবসা বড় বেশী নেই। কিন্তু বাংলায় যে শোলার চাষ হওয়া অসম্ভব তা নয়। বাংলায় শোলার চাষ হলে চাষীদের খুব সহজে আয় বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার হাওয়া বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক
পুণ্য হউক্, হে ভগবান্।
বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক্ পূর্ণ হউক্
পূর্ণ হউক্ হে ভগবান্।

—রবীন্দ্রনাথ।

চাষীদের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে ও অবস্থার কি রকমে উন্নতি হতে পারে সে সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা আলোচনা করা হ'ল। এ বিষয়টা এত বড়ো যে এ সম্বন্ধে সমস্ত কথা বলে শেষ করা সম্ভব নয়। চাষার উন্নতির কথা বল্‌লে গেলে কেবল মাত্র কোনখানে কি চাষ করা উচিত কোন চাষ কমান উচিত কিসের চাষ বাড়ান উচিত—এই বল্লেই হবে না—প্রত্যেক চাষের কি রকম করে উন্নতি হয়—কি করে কোন্ জিনিষের চাষ করলে

সেই জিনিষের ফলন বেশী হয়, কেমন করে পোকা লাগে না—এ সমস্ত জিনিষ বলা উচিত। আবার কেবল তা বল্‌লেই হবে না এই সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক খুটীনাটী—যেমন কি করে রেশমের পোকা ভাল বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পারা যায় ইত্যাদি সমস্তই বলতে হবে। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। তাই চাষের হাতে কলমে ছোট ছোট ব্যাপারের আলোচনা না করে একটু বড়ো ভাবে যা যা হওয়া সম্ভব সব বিষয়ই আলোচনা করা হল।

এ পর্য্যন্ত প্রায় সব বিষয়েই প্রায় নতুন নতুন কথা বলা হয়েছে। চাষের নতুন পন্থা, জল সেচনের নতুন উপায়, সমবায় প্রভৃতি যে সব জিনিষ এখনো গড়ে উঠে নি,—সেই সব নতুন জিনিষের কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু এইখানে বলে রাখা উচিত যে আমাদের দেশে যে সব উপায় অবলম্বিত হয় সে সমস্তই যে ছেড়ে দিতে হবে, তা নয়। আমাদের দেশের চাষাদের মধ্যে যে কত সহস্র যুগের জ্ঞান সঞ্চিত হয়ে আছে তার ইয়ত্তা করা যায় না। চীন দেশের চাষীদের বলা হয় (farmers of forty centuries) চল্লিশ শতাব্দীর চাষা। আমা-আমাদের দেশের চাষাদের সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই খাটে। হাজার হাজার বছর থেকে আমাদের চাষীদের মধ্যে অজ্ঞাতসারে অনেক জ্ঞান সঞ্চিত হয়ে আছে সেটা অবহেলার জিনিষ নয়। এ সম্বন্ধে ডার্লিং সাহেব বলেছিলেন যে "যেমন বটগাছ চারধারে শিকড় ছড়িয়ে রাখে, তেমন গ্রামে গ্রামে বহুযুগের জ্ঞান বদ্ধমূল

হয়ে আছে। এই জ্ঞানধারাই গ্রামের শ্রেষ্ঠ রক্ষক। এই জ্ঞানতরুর পাশে নতুন জ্ঞানধারা ছোট চারার মত। তাকে এখনও বহু ঝড় সহ্য করে শিকড় গাড়্‌তে হবে·········সেই জন্য পল্লীর পুনঃ সংগঠন কর্‌তে হলে আমাদের গ্রামের এই জ্ঞান-ধারার দিকে চেয়ে থাক্‌তে হবে ও পল্লীসংস্কারের উপায় নির্দ্ধারণ করার জন্য চাষীর মত অনুসারে চল্‌তে হবে।" সেই জন্য পুরাণকে একেবারে ভাঙা আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়, দরকারমত পুরাণকে নতুন করে গড়ে নেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—পুরাণ জ্ঞানের নব প্রকাশপন্থা খুঁজে বার করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

এই কাজের জন্য আমাদের উচিত হচ্ছে যে যেসব পুরোনো জিনিষ আছে তার পাশে পাশে ধীরে ধীরে এক একটা নতুন জিনিষ স্থাপনা করা। যেমন যেখানে অত্যন্ত খারাপ পাট চাষ হচ্ছে, সেখানে একটা ভাল পাট দিলে চাষীরা সহজেই সেটা গ্রহণ কর্‌বে। তারপর কয়েক বৎসর সেই নতুন পাট চাষ কর্‌তে কর্‌তেই তারা হয়তো নিজেরাই বুঝ্‌তে পারবে যে—এর জন্যে একটু গভীর চাষ করা দরকার। ঠিক সেই সময়েই যদি গ্রামের মধ্যে কিছু জমি নিয়ে কেউ উন্নত লাঙল চালাতে আরম্ভ করলে, তা হলে হয়তো চাষীরা আপনা হতেই সেই লাঙ্গল ব্যবহার করতে আরম্ভ কর্‌বে। তারপর যদি দুএকবছর চাষ হওয়ার পর কোন এক বছর অনাবৃষ্টি হ'ল আর

সেই বছর যদি খুব ভাল ভাবে প্রচার করা যায় তা হলে চাষীরা বুঝবে যে জল সেচের একটা সুব্যবস্থা দরকার। সেই সময় যদি তারা চোখের সামনে একটা আদর্শ পায় তা হ'লে তারা আপনারাই সমবায় করে নিজেদের দুঃখ দূর কর্‌বার জন্য উদ্‌গ্রীব হবে।

আসল কথাটা এই যে জিনিষটাই আমরা চাষীদের দিতে যাইনা কেন, সেটা ঠিক এরকম সময়েই চাষীদের সামনে উপস্থিত করতে হবে, যখন চাষীরা নিজেরাই মনে মনে সে রকম কোন একটা জিনিষের প্রয়োজনীয়তা বুঝেছে। ঠিক সেই সময়েই যদি তারা সেই নতুন জিনিষটা পায়, তাহলে আর সেটা তাদের উপরে চাপান কোন জিনিষ হবে না সেটা তাদের নিজেদেরই সৃষ্টি হবে—তার উপরে তাদের সম্পূর্ণ দখল থাক্‌বে। এই রকম ভাবে যে কোন নতুন জিনিষই প্রবর্ত্তিত হোক্ না কেন, সেইটাই সফল হবে বলে মনে হয়।

এইখানে আর একটা কথা বলা উচিত যে কোন নতুন জিনিষ প্রবর্ত্তিত করায় শ্রেষ্ঠ সময় হচ্ছে কোন সঙ্কট কাল; যে সময় চাষীদের ভাল চাষ হয় নি', তাদের ঘরে অন্ন নেই, চারিদিকে হাহাকার উঠেছে—সে সময় তারা তাদের সমস্ত চিরাচরিত প্রথা ত্যাগ করে, যাতে তাদের জীবন বাঁচে সে জন্য সমস্ত কিছু করতে রাজি থাকে; যে উপায়ে তাদের কিছু উপকার হবে শুন্‌লেই তারা সে উপায় আগ্রহে অবলম্বন করে

—সেই জন্য যে কোন নতুন জিনিষ প্রবর্ত্তিত করার সব চেয়ে ভাল সময় হচ্ছে কোন সঙ্কটকাল। এই সঙ্কটের সময় কাজ করানোতে যিনি কাজ করাবেন, তাঁরও সুবিধা আছে। প্রথমতঃ গ্রামের বা জমির কোন উন্নতি সাধন করতে হলেই জনমজুরের দরকার। সঙ্কটের সময় জনমজুর খুব সস্তায় পাওয়া যায়। সেই জন্য সঙ্কটের সময় যদি কেউ কোনো কাজ করান, তাহলে তিনিও সস্তায় কাজ করাতে পারবেন, আর সেই কষ্টের মধ্যে মজুরেরাও কিছু কিছু রোজগার করতে পেয়ে বাঁচবে।

আমাদের দেশে যখনি দুর্ভিক্ষ হয়, তখনি দেখা যায় যে খাবারের যে অভাব হয়েছে তা নয়। ১৩৩৭ সালের পর পর থেকে যে ব্যবসায় বাণিজ্য ও চাষবাসের মন্দা পড়ায় স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ হয়েছে, সে সব জায়গাতেই দেখা গিয়েছে যে কোথায়ও খাবারের অভাবে দুর্ভিক্ষ হয়েছে তা নয়। আমাদের দেশে আসল দুর্ভিক্ষ হচ্ছে টাকার দুর্ভিক্ষ। বাজারে খাবার রয়েছে, কিন্তু চাষীর হাতে টাকা নেই যে চাষী ধান চাল বা অন্যান্য দরকারী জিনিষপত্র কিন্‌বে, আমাদের দেশে চাষীর হাতে এমন কোন সঞ্চিত অর্থ নেই যে তারা বছরের পর বছর এই অর্থাভাবের সঙ্গে লড়াই করবে। কাজেই এক বছর তাদের ফসল না হলে যে তাদের খাবারের অভাবে কষ্ট পেতে হয় তা নয়—তাদের টাকা আসবার পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদের কষ্ট পেতে হয়।

আমাদের এই দুর্ভিক্ষ বা অর্থাভাব নিবারণ করতে হলে পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে সেগুলি সবই কম বেশী দরকার। এখানে আর একবার সেগুলি সংক্ষেপে বলা হচ্ছে।

প্রথমতঃ চাষের সব রকম উন্নতি করা দরকার। এ বইয়ে সে কথাটার উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে। আমাদের এই কৃষিপ্রধান দেশকে যদি আমরা একেবারে শিল্প প্রধান করে তুলতে চাই তবে সেটা সহজে সম্ভব হবে না—আর যদি বা সম্ভব হয়, তা হলেও সেটা বহু সময়সাপেক্ষ। আবার আমাদের দেশে যে তার ফল কি রকম হবে, তাও ভাববার বিষয়। সেই জন্য আমাদের দেশের কিছু উন্নতি করতে হলেই চাষের উন্নতি সকলের আগে দরকার। আর সেইটেই সবচেয়ে সহজে সম্ভব। আমাদের দেশে চাষীরা যখন যাতে বেশী লাভ পায় সেইটেই চাষ করে। তাতে যে তারা নিজেরাই চাহিদার বেশী চাষ করে নিজেদের সর্ব্বনাশ করে, তা বোঝে না। যখন পাটের দাম উঠেছিল তখন ধান ও অন্যান্য চাষ বন্ধ করে দিয়ে চাষী কেবল পাট চাষ করেছিল। তারই ফলে বাংলায় এই দুর্দ্দশা। কাজেই আমাদের দেশে খাবার জিনিষের চাষ—যেমন ধান গম ইত্যাদি ও অর্থকরী ফসলের চাষ (money cropএর চাষ) যেমন পাট ইত্যাদি দুটোই প্রায় সমান সমান থাকা উচিত। আমাদের দেশে কেবল যে খাবার

জিনিষেরই চাষ হবে, বা কেবল যে money cropএরই চাষ হবে তা হলে চল্‌বে না।

বহু চাষী বছরে চার মাস কাজ করে, বাকী আট মাস বসে থাকে। সে জন্যে এখন সহজসাধ্য কুটীর শিল্প প্রবর্ত্তন কর্‌লে তাদের অনর্থক সময় নষ্ট হবে না ঐ আট মাসে তারা বেশ কিছু রোজগার কর্‌বে।

আমাদের চাষীর শিক্ষা বিস্তার করা আমাদের একান্ত দরকার হয়ে পড়েছে। এ সম্বন্ধে সরকারী কৃষি কমিশন বলে গেছেন যে চাষীদের পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষাই খুব বেশী দরকার। কিন্তু সে শিক্ষা যে কেবল পুঁথিগত শিক্ষা হবে তা নয়। বাংলায় পুঁথিগত শিক্ষা যে পরিমাণে হচ্ছে সে পরিমাণে হাতে কলমে শিক্ষা হচ্ছে না। পাঞ্জাবে middle vernacular school গুলিতে কৃষিশিক্ষা একটা বিষয় হয়েছে। সেখানে প্রত্যেক ছেলেকে সপ্তাহে দু ঘণ্টা ইস্কুলের বাগানে খাট্‌তে হয়। কেবল মাত্র গোপালন ছাড়া আর সব কাজ ছেলেরাই করে—তারা যে কেবল তাদের বাগান থেকে কোন রকমে খরচা পুষিয়ে নেয়, তা নয়—বেশ কিছু আয়ও করে। লায়ালপুর এগ্রিকাল-চারাল কলেজের সঙ্গে প্রত্যেক ইস্কুলের সঙ্গে যোগ আছে। পাঞ্জাবে এখন এরকম ইস্কুলের সংখ্যা ১৬১।

সরকারী কৃষি কমিশন এরকম ইস্কুলের প্রশংসা করেছেন। কিন্তু বোম্বাইয়ে আর এক ধরনের কৃষি বিদ্যালয় আছে

তারও উল্লেখ করা উচিত মনে করি। পুণার কাছে লোনিতে একটী মারাঠী কৃষি বিদ্যালয় আছে। সেখানে মোট পঞ্চাশটী ছেলে নেওয়া হয়। সেখানকার নিয়ম হচ্ছে যে যেসব ছেলে ভর্ত্তি হতে আসবে তাদের পনের হতে সতর বছর বয়স হবে—তারা অন্ততঃ মারাঠী চতুর্থ মান পর্য্যন্ত পড়ে আসবে, তারা হয় চাষী না হয় জমিদারের ছেলে হবে, আর তারা প্রতিজ্ঞা কর্‌বে যে বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখে তারা নিজেদের জমির উন্নতি করার চেষ্টা কর্‌বে—গভর্ণমেণ্টের চাক্‌রী বা অন্য কোন কৃষি বিদ্যালয়ে চাক্‌রী নেবে না। দু বছরে সমস্ত পড়া শেষ হয়। প্রত্যেক ছেলেকে প্রত্যেক দিন তিন ঘণ্টা করে খাট্‌তে হয়। দ্বিতীয় বছরে প্রত্যেক ছেলেকে কিছু কিছু করে জমি আলাদা করে দেওয়া হয়। সে জমির ফসল হতে লাভ লোক্‌সানের জন্য তারা দায়ী হয়। ছাত্রেরা যদি পুরো দু বছর বিদ্যালয়ে থাকে, চল্‌তি খরচ ছাড়া আর তাদের অন্য খরচ দিতে হয় না। সরকারী কৃষি কমিশন এটাকে খুব ভাল বলেন নি। কিন্তু আমার মনে হয় বাংলার পক্ষে এই শেষেরটীই বেশী উপ-যোগী। প্রথমটীতে পুঁথির বিদ্যার সঙ্গে কৃষিকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শেষেরটীতে কৃষিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সেইজন্য শেষেরটীকেই একটু ভেঙ্গেচুরে নিলে বাংলায় অনেক কাজ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে ধয়।

যদিও নব প্রকাশিত এডুকেশন রেজলিউসনে গভর্ণমেণ্ট

বলেছেন যে যাতে ছেলেরা কৃষিকাজকে হেয় না মনে করে সে জন্য প্রত্যেক ইস্কুলে একটা করে ছোট ফার্ম থাক্‌বে—সেখানে ছেলেরা অবসর সময়ে ফল তরকারী উৎপন্ন কর্‌বে, আর তা ছাড়া ছুতারের কাজ প্রভৃতি শিল্প শিখবার জন্যে ইস্কুল থাকবে তা হলেও এর ফলাফল কতদূর হবে তা বলা যায় না।

একটু ভাল করে দেখলে মনে হয় যে কৃষিকমিশন যেরকম উন্নতির আশা নিয়ে কথা বলেছিলেন, সে রকম উন্নতি তো হবেই না,—এমন কি এতে ছেলেদের মনোবৃত্তি পর্য্যন্ত কিছু বদ্‌লাবে কিনা সন্দেহ। সাধারণ পুথিগত বিদ্যার মধ্যে মধ্যে এই কৃষি-বিদ্যার টুক্‌রো আদরে গৃহীত হবে বলে মনে হয় না—হলেও তাতে কতদূর উপকার হবে, তা বলা যায় না। আর ছোট ছোট গ্রাম্য শিল্প শেখার জন্য যদি অনেক ইস্কুল হয় অথচ সে শিল্পের প্রয়োজন না থাকে,—তা হলে যারা এখন গ্রামে বসে এই সব শিল্পে বেঁচে আছে তাদেরও অন্ন যাবে, নতুন শিক্ষার্থীদেরও পয়সা হবে না।

এই গেল মোটামুটী কার্য্যকরী শিক্ষার কথা। কিন্তু এর চেয়েও আরও একটা বড়ো সমস্যা রয়েছে। আমাদের দেশে চাষীরা একেবারে আত্মনির্ভরহীন, দুর্ব্বল। তারা যে সমস্ত বাংলার ভিত্তি সে জ্ঞানটা তাদের নেই। সারা বাংলার মধ্যে তাদের কি স্থান তা তারা জানে না। অবশ্য এর কারণও যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু বাংলার উন্নতি করতে হ'লে চাষীদের এই

মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তিত করে দিতে হবে। তাদের আত্মনির্ভরতা আসুক। তারা নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সজাগ হোক্। তারা শক্তি সম্বন্ধে সজাগ হোক্ মানে এ নয় যে তারা সারা বাংলাময় বিপ্লবের ঢেউ তুলে বেড়াবে। সত্যি সত্যি যখন শক্তির উদ্ভব হয়, তখন কোন বিপ্লব হয় না—তখন প্রকৃত ভাল গঠনমূলক কাজের দিকেই বেশী নজর পড়ে। কাজেই চাষীরা জেগে উঠুক—জেগে উঠে নিজেদের উন্নতি সম্বন্ধে সচেতন হোক্।

এ জন্যে গ্রামে গ্রামে প্রচার কাজ অত্যন্ত দরকারী। পাঞ্জাবে যেমন অনেক গ্রামে এক একটা পল্লীসংগঠন সমিতি করা হয়েছে আর সেই সভা থেকে প্রচার কাজ হচ্ছে বাংলার গ্রামে গ্রামে যদি সেই রকম সমিতি স্থাপিত হয়, তবে অনেক কাজ হতে পারে বলে মনে হয়। এ ছাড়া বাংলায় চাষীদের জীবন যাত্রা ও বাসস্থানের উন্নতির জন্য সমবায় করে কাজ করাতেও কম উপকার হবে না।

সরকারী কৃষি কমিশন বলেছিলেন যে চাষীদের মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তিত করে দিতে হলে একেবারে একসঙ্গে তাদের সমস্ত সমস্যাগুলিকে দূর করার চেষ্টা করতে হবে। যদি কৃষিঋণ দূর করতে পারা যায়—অথচ চাষের উন্নতির ব্যবস্থা না করা হয়—তা হলে তারা আবার ঋণজালে জড়িয়ে পড়বে তেম্নি যদি উন্নত প্রণালিতে চাষবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় অথচ সেগুলি বাজারে ঠিক মত বিক্রি করার ব্যবস্থা না হয়—

তা হলে তারা কোনই লাভ কর্‌তে পার্‌বে না। সেই জন্য যদি তাদের কোন চিরস্থায়ী উন্নতি কর্‌তে হয়, যদি তাদের মনোবৃত্তি বদ্‌লে দিতে হয়, তা হলে আস্তে আস্তে এক একটী করে কর্‌লে হবে না—একসঙ্গে সমস্ত দিক্ শোধন করার চেষ্টা কর্‌তে হবে।

এই সম্বন্ধে সরকারের কর্ত্তব্য কতটুকু সেটা আলোচনা কর্‌লে দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে এ সম্বন্ধে সরকারের কর্ত্তব্যই অনেক বেশী। প্রত্যেক দেশেই সরকারের প্রচেষ্টায় অল্প-সময়ে যে উপকার সাধিত হয়েছে—জনসাধারণের চেষ্টায় বহুবৎসরে তা হয়েছে কি না সন্দেহ। ইন্‌ডাসট্রীয়াল কমিশনের জন্য খবরাখবর জান্‌তে হ্যামিল্‌টন সাহেব (C. J. Hamilton Ex-Minto-Professor of Economics) জাপানে গিয়ে ছিলেন। সেখান হতে ফিরে এসে তিনি বলেন যে জাপানে যে এত উন্নতি হয়েছে—তা প্রধানতঃ সরকারের সাহায্যেই। আমেরিকা যুক্তপ্রদেশের প্রেসিডেন্ট হুভার বলেছিলেন—"It is obviously the function of the government to investigate economic and scientific problems, to point out the remedy for economic failure or the road to progress and to inspire and assist in co-operative action."—

"এখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে দেশের অর্থনৈতিক

সমস্যার কারণ অনুসন্ধান করা, অর্থনৈতিক দুরবস্থার নিবারণ করে উন্নতির পথ দেখিয়ে দেওয়া, আর সমবায় কার্য্যে সাহায্য করা—এ সরকারেরই কর্ত্তব্য"। আমাদের দেশ সম্বন্ধে সরকারী কৃষি কমিশন বলেছিলেন—"মুক্ত কণ্ঠে বল্‌ছি…উন্নতির প্রথম সোপান তৈরীর ভার সরকারের উপর। …যদি এই যুগযুগান্তর হতে সঞ্চিত জড়তা দূর কর্‌তে হয় তবে পল্লী সংস্কারের জন্য সরকারের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য প্রয়োগ করা উচিত"। *

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ সে কথামত কোন কাজ হয় নি। বিশেষতঃ বাংলা গভর্ণমেণ্ট অন্যান্য গভর্ণমেণ্টের তুলনায় বাংলায় পল্লী সংগঠনের জন্য কৃষি উন্নতির জন্য কিছুই করেন নি। সামান্য দু' একটা হিসাব হতেই তা বোধগম্য হবে।

শিক্ষার জন্য মাদ্রাজে সরকার খরচ করেন—২৫৫৭১৭১৫ বোম্বায়ে—১৯০০১৬৫৪, যুক্তপ্রদেশ—২১৭৯৭৬৩৩, পাঞ্জাবে—১৬৪৯২৬৪১, কিন্তু বাংলায় মোটে ১৪৪৪৬৮৫১। অথচ বাংলার জন সংখ্যা সব চেয়ে বেশী। জলসেচের বেলায় বাংলা সরকার যে কতটা পেছিয়ে আছেন তা ২৬ পৃষ্ঠার হিসাব হতেই বোধ-

*We have no hestation in affirming that the responsibility for initiating the steps required to effect the improvement rests with Government.........If the inertia of centures is to be overcome, it is essential that all the resources at the disposal of the State should be brought to bear on the problem of rural uplift.

Abridged Report p. 89.

গম্য হবে। তারপর ১৯২২ সাল হতে ১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষ নিবারণের খরচের হিসাব নিলে দেখ্তে পাওয়া যাবে যে এক মাদ্রাজ ছাড়া বাংলায় মাথাপিছু খরচ সবচেয়ে কম। কিন্তু আমাদের তো মনে হয় যে এ ক' বৎসরে বাংলাই সব চেয়ে বেশী দুর্ভিক্ষ পীড়িত হয়েছে।

সেইজন্য যখন সরকার সেরকম উৎসাহ সহকারে পল্লী-সংস্কারের দিকে মনোযোগ দেবার কোন লক্ষণ দেখাচ্ছেন না, তখন পল্লীসংস্কারের ভার জনসাধারণকেই নিতে হবে। আর তাতে যে জনসাধারণের কোন ক্ষতি আছে তা নয়। এবং তাতে জনসাধারণের ক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাবে।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে আমাদের দেশে উপর হতে কিছু জোর করে চাপিয়ে দিতে গেলে সে বেশীদিন থাক্‌বে না। সেই জন্য আমাদের পল্লীসংস্কার আস্তে আস্তে নীচে থেকে গড়ে উপরে উঠে আস্‌বে। আর জনসাধারণ যেখানে পল্লীসংস্কারের কর্ত্তা তখন এ ছাড়া উপায় নেই।

বস্তুতঃ কি সরকারের বেলা কি জনসাধারণের বেলা পল্লী-সংস্কার যদি চাষীদের মন থেকে উদ্বুদ্ধ না হয়, তা হলে সে কখনও সফল হয় না। গুঁরগাও প্রচেষ্টা ভূমিসাৎ হবার এক মাত্র কারণই এই। সেইজন্য যখন সরকারও পল্লীসংস্কার

সচেষ্ট হবেন, তখন প্রজাদের উদ্বুদ্ধ করে দিয়েই সরকারী প্রচেষ্টা থামিয়ে দিতে হবে। শিল্প সম্বন্ধে ইন্‌ডাস্‌ট্রীয়াল কমিশন ঠিক এই রকম কথাই বলেছিলেন ও কৃষি সম্বন্ধে কৃষি কমিশনও এর পুনরুক্তি করেছেন।

সরকার ও জনসাধারণের দিক্ হতে পল্লীসংস্কারের প্রচেষ্টা এরকম ভাবে হবার আগে বা হবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় জমিদারেরা পল্লীসংস্কারে প্রচুর সাহায্য করতে পারেন। সত্যি কথা বল্‌তে গেলে পল্লীসংগঠনের কাজ তাদের দ্বারা যেরকম সহজ হতে পারে, অন্য কোন সম্প্রদায়ের দ্বারা সে কাজ তত সহজে পারে কি না সন্দেহ। তাঁদের যেমন অর্থবল আছে, তেমনি' সম্মান আছে। এ অবস্থায় যদি তাঁরা সত্যি প্রজার উপকারের দিকে মন দেন, তা'হলে যে কেবল প্রজারা তাঁদের ভালবাসবে তা নয়, তাঁদেরও অনাদায়ী খাজনা অতি সহজে আদায় হবে ও তৎসংক্রান্ত মামলা খরচ বহুপরিমাণে কমে গিয়ে তাঁদের লাভই হবে। অবশ্য ১৮৫৯ সালের রেণ্ট য়্যাক্টের পর হতে ক্রমান্বয়ে তাঁদের যে এসব বিষয়ে বেশী কিছু করবার শক্তি খর্ব্ব হয়ে পড়েছে এটা সত্য কথা। তার প্রমাণ হচ্ছে সরকারী কৃষি কমিশনের উক্তি। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথা বল্‌লে হবে যে রেণ্টয়্যাক্ট হোক্ বা নাই হোক্ তাঁদের পক্ষ হতে পল্লীসংস্কারে ব্যয় বেশী হয় নি বা এখনও হচ্ছে না। কিন্তু সারাজগতে শ্রমিক ও ধনিকের যে বিরোধ প্রকাশ পেয়েছে, তা বাংলাতেও প্রস্ফুট হয়ে উঠেছে। সেই

জন্য তাঁদের বেঁচে থাক্‌তে হলে তাঁদের নায়ক হয়ে প্রজাদের জাগিয়ে তোলা উচিত। *

কয়েক বছর হ'তে বাংলার উপর যেন বিধাতার কোপ পড়েছে। প্রত্যেক বছরই হয় দুর্ভিক্ষ, নয় বন্যা। এক একটা বিপদ লেগেই আছে। এই সময় বাংলার চাষী যদি ধরাপৃষ্ঠ হতে লুপ্ত হয় তা'হলে বাংলার ভিত্তিই বিলুপ্ত হবে। কাজেই এই সঙ্কটের সময় চাষীকে যেমন করেই হোক্ বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হবে, তাদের আবার সুস্থ সবল করে তুল্‌তে হবে। রবীন্দ্রনাথের কথায়—

—এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা, ডাকিয়া বলিতে হবে,
মুহূর্ত্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পালাইবে ধেয়ে।

---

* "Where existing system of tenure or tenancy laws operate in such a way as to deter landlords, who are willing to do so, from investing capital in the improvement of thier land, the subject should recieve careful reconsideration with a view to the enactment of such amendments as may be calculated to remove the difficulties."

তা হলেই সারা বাংলা আবার সুজলা সুফলা হয়ে উঠবে। বাংলার বাতাস মধুময় হোক্, বাংলার নদী হতে মধুক্ষরণ হোক্, বাংলার ওষধি বাংলার চন্দ্র সূর্য্য ঊষা রাত্রি, আকাশ, বাতাস, বাংলার প্রতি ধূলিকণা পর্য্যন্ত মধুময় হয়ে উঠুক !—

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তু সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ণ সন্ত্বোষধীর্মধু
নক্তমুতোসষঃ মধুবৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দৌরস্তু নঃ পিতা
মধুমান্নো বনস্পতি। মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যো
মাধ্বী র্গাবো ভবন্তু নঃ॥ মধু মধু মধু॥

পরিশিষ্ট ক

জমির জলনিকাশ

দ্বিতীয় অধ্যায়ে জমির কথা বল্‌তে গিয়ে বলা হয়েছে যে জলাজমির জলনিকাশের শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা হচ্ছে মাটীর তলায় ড্রেন করা। এই ড্রেন কি রকম করে তৈরী কর্‌তে হয়, সে সম্বন্ধে দু' একটা কথা বলা উচিত।

যে সব জায়গায় জমি ধাপে ধাপে নেমে গিয়েছে সে সব জায়গাতেই এ ব্যবস্থা খুব সুবিধাজনক। প্রথমতঃ, মাটীর ভিতরে ৬´ ফুট নীচে ২´ ফুট চওড়া একটা নালা কাট্‌তে হবে। ড্রেনের তলায় পাথরকুচি, ইঁটের কুচি ইত্যাদি দিয়ে পিটিয়ে বেশ শক্ত করে দিতে হবে। ড্রেনের পাশ দুটোয় একখানা করে ইঁট এমনভাবে বসিয়ে দিতে হবে, যাতে মাটী ধসে পড়ে ড্রেন বন্ধ না করে, অথচ পাশ থেকে ইঁটের ভিতর দিয়ে জল আস্‌তে পারে। তারপরে যাতে মাটীতে ড্রেন বন্ধ না হয় সেজন্য ড্রেনের উপর ইঁট হোক্‌, পাথর হোক্‌, টালি হোক্‌—যা হয় একটা কিছু চাপা দিতে হবে। এই রকম ভাবে একটা মেন ড্রেন করে তারপাশে ছোট ছোট পাইপ বসিয়ে দিতে হবে বা ছোট ছোট ড্রেন কেটে দিতে হবে। সবশেষে আবার সমস্ত জিনিষটা মাটী চাপা দিয়ে দিতে হবে। একটা মেন ড্রেন হতে অন্ততঃ ত্রিশফুট দূর আর একটা মেন ড্রেন হবে। এরকমভাবে ড্রেন কর্‌লে মাটীর তলা হতে জল উপরে না উঠে নীচে দিয়েই জল বেরিয়ে যাবে। উপরে জমি নষ্টও হবে না, অথচ সর্ব্বদা সরস থাক্‌বে।

পরিশিষ্ট খ

একটী চাষী পরিবারের বাৎসরিক খরচ

তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে চাষীর প্রধান আয় জমি হতেই, আর ধান বা পাটের আয় হতেই প্রধানতঃ তাদের সংসার চলে। এইভাবে তাদের আয় ধরা হয়েছে ২১৬৲ থেকে ১৬৮৲ টাকা আর ব্যয় ধরা হয়েছে ৪১০৲। এখানে আমরা চাষীর ব্যয়ের একটা হিসাব দিচ্ছি।

(বাংলার ব্যাঙ্কিং এন্‌কোয়ারী কমিটীর রিপোর্ট হইতে গৃহীত)

		১৯৩০
চাষের খরচ—		
যন্ত্রপাতি—		৩৷৷৵০
গরুবলদ—		১২৲
বীজ—		১৩৲
সার—		০
মজুরী—		৪০৷৷০
	মোট	৬৯৵০
খাজনা প্রভৃতি—		
খাজনা—		২৫৲
সেস্—		৸০
কমিশন—		১৷৷/০
রেট (Rates)—		১/০
	মোট	২৮৷৵০
আহার—		২২৫৲
বস্ত্রাদি—		৩৫৲

অন্যান্য—

তেল খরচ—	৫৷৶৹
পানতামাক—	৭৷৶৹
মেরামত—	১২৲
সামাজিক ও ধর্ম্মানুষ্ঠান—	১৫৲
লেখাপড়া, সামাজিকতা ইত্যাদি—	২২৲
মোট	৬২৷৹
সর্ব্ব মোট	৪২০৲

পরিশিষ্ট গ

কতকগুলি ফসলের চাষের কথা

(বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং এন্‌কোয়ারী কমিটীর রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত)

পাট (এক একর জমি)

		মানুষ খাটে	গরু খাটে
জমি তৈরী	...	১৪ দিন	২৭ দিন
নিড়ান	...	২৫ "	...
ফসল কাটা	...	২০ "	...
আঁশ ছাড়ান প্রভৃতি		২৩ "	২ দিন
	মোট	৮২ "	২৯ "

		প্রেসিডেন্সী বর্দ্ধমান ও রাজসাহী বিভাগ	ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ
মজুরী	...	৪৯॥০	৫৪৲
বলদের খরচ	...	২১৷৵০	২১৷৵০
বীজ	...	৩৲	৩৲
সার	...	১০৲	১০৲
খাজ্‌না	...	৬৲	৬৲
	মোট	৯০।০	৯৪৷৵০

ধান

	আউস		আমন	
	মানুষ খাটে	গরু খাটে	মানুষ খাটে	গরু খাটে
জমি তৈরী	১৪ দিন	২৭ দিন	১৪ দিন	২৮ দিন
রোপন করা	...	...	৮ „	...
নিড়ান	১৬ „	২ „	২ „	...
ফসল কাটা	৮ „	...	৯ „	২ „
বোঝাই দেওয়া	১ „	২ „	...	...
মোট	৩৯	৩১	৩৩	৩০

পাটের দর অনুযায়ী মজুরী ও গরুবলদের খরচ ধরিয়া—

	প্রেসিডে বর্দ্ধমান রাজসাহী		ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ	
	আউস	আমন	আউস	আমন
মজুরী	২৬৮/০	২২॥৶০	২৯॥৵০	২৪৸০
বলদ খরচ	১১॥৵০	১১।০	১১॥৵০	১১।০
মণ প্রতি ।০ ধরিয়া				
মাড়াই খরচ	৪৲	৪৲	৪৲	৪৲
বীজ	২৲	...	২৲	...
সার	...	৫৲	...	৫৲
খাজনা	৩৲	২॥০	৩৲	২॥০
মোট	৪৭।৶০	৪৫।৶০	৫০৲	৪৭॥০

একর প্রতি ফলন	১৬মণ	১৬মণ	১৬মণ	১৬মণ
১৯৩৫ সালের মণকরা দাম (Harvest Price)	২৸৶০	৩৲	২৷৷০	২৸৶০

আলু, আখ ও তামাক (বিঘা প্রতি খরচ)

	আলু		আখ		তামাক	
	মানুষ খাটে	গরু খাটে	মানুষ খাটে	গরু খাটে	মানুষ খাটে	গরু খাটে
জমি তৈরী	৬	১২	৬	১২	৬	১২
গর্ত্ত খোঁড়া ও গাছ বসান	...	...	৪	...	...	...
জমিতে আঁচড়া দেওয়া ও গাছ বসান	৩	...	...	...	...	...
রোপণ করা	...	...	...	...	১০	...
রোপণ করা ও জল দেওয়া	...	...	...	...	৩	...
আঁচড়া দেওয়া ও নিড়ান	...	...	৭	...	...	...
আঁচড়া দেওয়া, নিড়ান ও ডগা ছাঁটা	...	...	...	...	৩	...
মাটী খুসিয়া দেওয়া	৩	...	...	...	...	...
ডেলা ভাঙা	...	...	৩	...	...	...
জল দেওয়া	২	...	...	...	৩	...
ফসল কাটা	২	...	৩	...	..	...

	আলু		আখ		তামাক	
ফসল কাটা ও শুখান	...	...	...	...	৫	...
মাড়াই	...	...	৮	৮	...	...
আলান	...	...	৮	...	...	...
মোট	১৬	১২	৩৯	২০	৩০	১২

	আলু	আখ	তামাক
১১ আনা রোজ মজুরী	১১৲	২৬৸/০	২০॥৶০
৬ আনা রোজ বলদ	৪॥০	৭॥০	৪॥০
	১৫॥০	৩৪।/০	২৫৶০
বীজের দাম, বীজ বোনা ও ফসল কাটার খরচ	৫০৲	২০৲	৪৲
খাজনা	২৲	৩৲	২৲
সারের খরচ	২২॥০	৩৫৲	২৫৲
মোট	৯০৲	৯২।/০	৫৬৶০
বিঘা প্রতি ফলন	৫০মণ	১২.৩মণ	৪.১মণ
১৯৩৫ সালে মণকরা দাম	...	৪/০	৭৶০

পরিশিষ্ট ঘ

১৯৩০ সাল হইতে ১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত চাষীর জীবন যাত্রার ব্যয়বৃদ্ধির আনুমানিক হিসাব

	১৯৩০ *	১৯৩৫ ⁂
আহার ও তামাক	২৩২৲	৩৩৩৲
পরিধেয় ও বিছানা	৩৫৲	৩৭৲
অন্যান্য জিনিষ, কেরোসিন	৬৲	১১৲
উৎসব, বিবাহ, শ্রাদ্ধের খরচ	১৫৲	১১৲
ডাক্তার ও ঔষধ খরচ	...	৮½৲
বাড়ী তৈরী ও মেরামত	১২৲	১০½৲
শিক্ষা	...	৮৲
যাত্রা, গয়না, বিলাসিতার দ্রব্য	...	১০৲
অন্যান্য	২২৲	...
মোট	৩১২৲	৪২৯৲

* বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং এন্‌কোয়ারী কমিটী রিপোর্ট হইতে গৃহীত।

⁂ বাংলা বোর্ড অফ্ ইকনমিক ইন্‌কোয়ারী, "বাঁকুড়া" ইস্তাহার হইতে গৃহীত।

পরিশিষ্ট ৬

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ছোট আকারে পিতলকাঁসার ফ্যাক্টরীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পাঠকের সুবিধার জন্য তার খরচের হিসাব তুলে দিচ্ছি—

প্রথম খরচ

১। কারখানার চালা তৈরী	১০০৲
২। কলকব্জা—	
(ক) প্রাইম মুভার, অয়েল ইঞ্জিন ১½ বি এইচ, ডি কেরোসিন অয়েল ইঞ্জিন	২৫০৲
(খ) ৩৬" লেদ (চামড়ার পেটী) ১টা	৪০৲
ঐ ফিট করার খরচ	১০৲
(গ) মেল্টিং ফার্ণেসের জন্য হ্যাণ্ড ব্লোয়ার (দিশী)	১৫৲
(ঘ) মিস্ত্রীর সরঞ্জাম	
(১) ড্রয়ার সমেত সেগুনকাঠের টেবিল	১৫৲
(২) হাতুড়ী, তুরপুন প্রভৃতি যন্ত্র	৭৫৲
(ঙ) ঢালায়ের সরঞ্জাম	৬৫৲
(চ) মেল্টিং ফারণেস ৩টী	১০৲
(ছ) কাঠের ও ধাতুর প্যাটার্ণ	২০৲
(জ) ক্রুডঅয়েল, ষ্টোভ ইত্যাদি অন্যান্য	১০০৲
	৭০০৲

অন্যান্য খরচ

১। ৭০০৲ টাকার জিনিষে শতকরা ৭½ ভাগ বছরে দাম-কম্‌তি (Depreciation)	৫৩৲
২। শতকরা ৫৲ হারে ৭০০৲ টাকার সুদ	৩৫৲
৩। শতকরা ১৲ মেরামতি	৭৲
	৯৫৲
দৈনিক	।৶০

চল্‌তি খরচ (দৈনিক)

১। অয়েল ইঞ্জিন—

(ক) তেল (খ) লুব্রিকেটিং তেল	১৲
২। কাঁচা মাল	
তামা, দস্তা, টিন, সীসা, আলুমিনিয়ম, পিতল ইত্যাদি—১মণ ঢালায়ের জন্য	১৮৲
৩। ঢালায়ের খরচ—	
কোক-কয়লা, কাঠ, কেরোসিন ইত্যাদি	৸০
৪। পালিশের খরচ—	।৴০
৫। মজুরী—	
ক। ঢালাইকার ১জন	১॥০
খ। পালিশকার ১জন	১।০
গ। ফিট করার লোক ১ জন	১৲
ঘ। মজুর	৸০
ঙ। কুলী	॥০
চ। পরিদর্শক	২॥০
সর্ব্বমোট দৈনিক খরচ	২৮৲
কমিশন খরচ শতকরা ৫ ভাগ	১॥০
	২৯॥০

আলুমিনিয়ম, কাঁসা, বা পিতল, ২৮সের তৈরী মাল বিক্রি ৩৫৲

আনুমানিক নিট্ লাভ— ৫॥০

(সতীশচন্দ্র মিত্র—'রিকাভারি প্ল্যান' হইতে গৃহীত)